প্রাচীন ভারতে উদ্ভিদবিদ্যা
বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ

বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ

প্রাচীন ভারতে উদ্ভিদবিদ্যা

শ্রীগিরিজাপ্রসন্ন মজুমদার

বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়
২ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট
কলিকাতা

শ্রীযুক্তা লতিকা মুখোপাধ্যায়, বি. এ.
স্নুচরিতাসু

যো দেবোঽগ্নৌ যোঽপ্‌সু
যো বিশ্বং ভুবনমাবিবেশ।
য ওষধিষু যো বনস্পতিষু
তস্মৈ দেবায় নমো নমঃ॥

ভূমিকা

উদ্ভিদবিজ্ঞান, অর্থাৎ যে বিজ্ঞানের সাহায্যে আমরা বৃক্ষ-গুল্ম-লতা-প্রতানাদির আকৃতি, প্রকৃতি, জন্ম, মৃত্যু, কার্য, বংশবিস্তার প্রভৃতির বিষয় জানতে পারি সেটা অত্যন্ত নবীন। আধুনিক উদ্ভিদবিদ্যা প্রাণবিজ্ঞান বা বায়োলজির অন্তর্ভুক্ত। প্রাণী শব্দে আমরা যার প্রাণ আছে তাকেই বুঝি। প্রাণী মাত্রেরই কতকগুলি বিশিষ্টতা আছে। বর্তমান উদ্ভিদবিদ্যার চরম উৎকর্ষ উদ্ভিদে প্রাণের অস্তিত্ব প্রমাণ করা। প্রাচীন কালে হিন্দুমনীষিগণও যে উদ্ভিদে প্রাণের অস্তিত্ব স্বীকার ও বিশ্বাস করতেন তার ভূরি ভূরি প্রমাণ আমাদের প্রাচীন শাস্ত্র, দর্শন, পুরাণ, ইতিহাস, সাহিত্য ও প্রবাদের মধ্যে পাই। উদাহরণ-স্বরূপ মনু ও ভাগবত পুরাণ থেকে উদ্ধৃত করা গেল। উদ্ভিদ সম্বন্ধে বলতে গিয়ে মনু বলেছেন—অন্তঃসংজ্ঞা ভবন্ত্যেতে সুখদুঃখসমন্বিতাঃ। ভাগবতপুরাণ উদ্ভিদের নিম্নলিখিত সাধারণ লক্ষণগুলি দিয়েছেন—(১) উৎস্রোতসঃ—যার আহারসামগ্রী নিচে থেকে দেহের উপরের দিকে যায়, (২) তমঃপ্রায়া অব্যক্তচৈতন্যাঃ, এবং (৩) অন্তস্পর্শাঃ।

যাতে প্রাণের অস্তিত্ব স্বীকার করা যায় তার একটা জন্ম, বৃদ্ধি, প্রসার, জরা, মৃত্যু ও আনুষঙ্গিক কার্যাবলীর ইতিহাস থাকা সংগত, এবং সেই ইতিহাস মানবের জ্ঞাতব্য বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত না হবার কোনো কারণ নেই। আমাদের পূর্বপুরুষগণ প্রথম থেকেই তাঁদের প্রতিবেশী গাছপালার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত ছিলেন। সুতরাং অতি প্রাচীনকাল থেকেই ভারতে উদ্ভিদ বিষয়ক বিশেষ জ্ঞানের অনুশীলন আরম্ভ হয়েছিল, এবং সেই জ্ঞান অন্যান্য ব্যবহারিক বিজ্ঞানের অনুশীলনে প্রয়োগ করা হ'ত। পরবর্তী কয়েক অধ্যায়ে আমরা ভারতবর্ষে উদ্ভিদবিদ্যার আরম্ভ প্রসার ও অবসানের একটা বিবরণ দিতে চেষ্টা করেছি।

প্রথম অধ্যায়

অবতরণিকা

মানবগ্রন্থাগারের প্রথম গ্রন্থ হিন্দুর ঋগ্বেদ। পৃথিবীর সভ্যতার ইতিহাসে হিন্দুসভ্যতার স্থান সকলের আগে। দর্শনশাস্ত্র, চিকিৎসা-বিজ্ঞান, বীজগণিত, অঙ্কশাস্ত্র, জ্যোতির্বিজ্ঞান, ফলিতজ্যোতিষ প্রভৃতি ব্যবহারিক বিজ্ঞান ভারতবর্ষে আরব ও গ্রীক সভ্যতার বহুপূর্বে কতখানি উৎকর্ষ লাভ করেছিল তার আভাস কিছু কিছু ওদের সাহিত্যে উল্লেখ আছে। ভারতবর্ষ থেকে হিন্দু দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিকের গ্রীক রাজদরবারে আমন্ত্রণ, হিন্দুর বহু গ্রন্থের আরব ভাষায় অনুবাদ ইত্যাদি এখন সর্বজনস্বীকৃত। কিন্তু দুর্ভাগ্য এমনি যে, আমাদের সম্বন্ধে কোনো কথাই আমরা বিশ্বাস করি নি যতদিন পাশ্চাত্য মনীষিগণ সেটা না বলেছেন। আমরা আমাদের অতীতকে দেখে এসেছি পরের চোখে।

বিজ্ঞানের ইতিহাস লিখেছেন পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক। তাঁরা প্রত্যেক বিজ্ঞানের মূল উৎস খুঁজেছেন গ্রীক ও রোমান দর্শন ও অন্যান্য সাহিত্যে। তাঁরা অ্যারিস্টটল্ সক্রেটিস্ প্রভৃতির কথার মধ্যে দেখেছেন বিজ্ঞানের নিহিত সত্য, কিন্তু সক্রেটিস্ প্লেটো অ্যারিস্টটল্ থিওক্রেস্টস্ প্রভৃতি জন্মাবার বহু আগে লেখা হিন্দুসাহিত্যে নানা বিজ্ঞানের যে বীজ ও অঙ্কুর বিকাশের সন্ধান আছে সেটা পশ্চিমের ইতিহাসলেখক হয় দেখেন নি, নতুবা সহজে স্বীকার করতে চান নি। এ বিষয়ে আমাদের ত্রুটিও আছে অনেক। কিন্তু বর্তমান যুগে হিন্দু তার নিজের অতীতের কথা ভাবতে শিখেছে এবং তার অতীতশাস্ত্র মন্থন ক'রে যে জ্ঞানভাণ্ডারের সন্ধান সে পেয়েছে, সেটা জগতের সামনে প্রকাশ করে মানবসভ্যতার ইতিহাসে হিন্দুসভ্যতার স্থান নির্দিষ্ট করতে সাহায্য করছে।

আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল *Positive Sciences of the Hindus* এবং আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় হিন্দু রাসায়নিকবিদ্যার ইতিহাস লিখে প্রমাণ করেছেন, হিন্দুরা ব্যবহারিক বিজ্ঞানে সমসাময়িক অন্যান্য জাতিকে পশ্চাতে ফেলে কতখানি এগিয়ে গিয়েছিল। বৈদিক সাহিত্য ও অন্যান্য প্রামাণিক গ্রন্থ থেকে দেখা যাচ্ছে উদ্ভিদবিজ্ঞানেও হিন্দুর দান কম ছিল না। এতদিন পশ্চিম এ দানের কথা জানতে চান নি। কিন্তু সম্প্রতি আমেরিকা থেকে আমাকে ভারতীয় উদ্ভিদবিদ্যার ইতিহাস লিখতে অনুরোধ করা হয়েছে, আমিও স্বীকার করেছি।

ব্রুক্‌লিন বটানিকেল গার্ডেন্ থেকে পৃথিবীর বৃক্ষবাটিকার খবর দিয়ে একখানা পুস্তক প্রকাশ করা হয়েছে। এতে বাগানের ইতিহাস দিতে গিয়ে প্রথম বাগানের পরিচয় আরম্ভ করা হয়েছে অ্যারিস্টটলের বাগান থেকে। এ গ্রন্থে হিন্দুসাহিত্যের কোনো বাগানের উল্লেখ নেই। অথচ বাগান হিন্দুর জীবনে একটি প্রাচীনতম আবশ্যকীয় অংশ। ঋগ্বেদে বাগান তৈরি ক'রে এবং তার সংরক্ষণের সুব্যবস্থা ক'রে তা সর্বসাধারণের ব্যবহারার্থে উৎসর্গ ক'রে দেওয়া একটি পুণ্য কার্য ব'লে উল্লেখ করা আছে। বৈদিক সাহিত্যের আরণ্যক অংশ অরণ্যে ব'সেই রচিত হয়েছিল। কিন্তু সে অরণ্য গহন বন ছিল না, ছিল ঋষির তপোবন। তপোবনের পরিচয়ে আমরা বাগান-বাটিকারই পরিচয় পাই। কণ্বমুনি ও বাল্মীকির আশ্রমে গাছপালা সুনিয়ন্ত্রিত ভাবে রোপণ করা, তাদের যত্ন করা, জলসেচন করা আশ্রমবাসীদের নিত্যকর্ম ছিল। সে সব আশ্রমে ফুল, ফল এবং আশ্রমবাসীদের প্রয়োজনীয় গাছপালা সযত্নে রোপন ক'রে পরিচর্যা করা হ'ত।

বৌদ্ধ যুগের সাহিত্যে বহু "আরাম" ও "বনে"র উল্লেখ ও বর্ণনা আছে। বহু অর্থব্যয়ে বুদ্ধের শিষ্য ও শ্রমণ ব্রাহ্মণদের থাকার ব্যবস্থা এই সমস্ত বাগানে করা হ'ত। কৌটিল্য-অর্থশাস্ত্রে সাধারণের ব্যবহারের জন্য নগরের মধ্যে পার্কের ব্যবস্থা করার উল্লেখ আছে।

এই সমস্ত পার্কে অধিপতি নিযুক্ত করা হ'ত ; পার্কের গাছপালার যত্ন করা, সার দেওয়া, জলসেচন, সময়মত নানা ফুল ও ফলের গাছ রোপণ, রোগে চিকিৎসা প্রভৃতির ব্যবস্থা আরামাধিপতি এবং তাঁর সহকারীদের করতে হ'ত। রামায়ণে অশোকবনিকার বর্ণনা অতুলনীয়। মৃচ্ছকটিকায় বসন্তসেনার বাগানের অতি সুন্দর বর্ণনা আছে। বাৎস্যায়ন কামসূত্রের মতে প্রতি নাগরিকের বাটিসংলগ্ন বৃক্ষবাটিকা থাকা একান্ত প্রয়োজনীয়। তক্ষশিলা বিশ্ববিদ্যালয়ে চিকিৎসাবিদ্যার্থীর হাতে-কলমে শিক্ষার জন্য ভেষজোদ্যান বিদ্যমান ছিল। বাগানকে উপলক্ষ ক'রে মালাকর এবং মালিনীকে কাব্য ও নাটকের একটি প্রধান অংশ দেওয়া হ'ত। সুতরাং ভারতবর্ষের বাগান বাদ দিয়ে পৃথিবীর বাগানের ইতিহাস সম্পূর্ণ হতে পারে না। যে কোনো বিজ্ঞানের ইতিহাস লিখতে ব'সে কোনো পাশ্চাত্ত্য বৈজ্ঞানিক যদি ভারতবর্ষের দানকে বাদও দেন—ইচ্ছা করেই হোক কিংবা অজ্ঞতাবশতই হোক—আমরা সেটা বাদ দিতে পারিনে। আমাদের উচিত নিজেদের ইতিহাস নিজেরাই লিখে ইউরোপ ও আমেরিকার বিজ্ঞানসমাজকে জানিয়ে দেওয়া, যেমন করেছেন আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল এবং আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়।

সমস্ত ব্যবহারিক বিজ্ঞানের আরম্ভই দেখতে পাই মানবের প্রয়োজন উপলক্ষ ক'রে। যেমন ধরুন, ফল আমাদের খাদ্য। বনের মধ্যে গাছ ভ'রে ফল পেকেছে দেখা গেল। খেয়ে দেখলাম অত্যন্ত সুস্বাদু ও পুষ্টিকর। ফলের নাম দিলাম 'আম'। এর পর আমগাছের বর্ণনার প্রয়োজনে তার মূল, কাণ্ড, শাখা, ফুল, ফল, বীজের নাম, বর্ণ, আকৃতি, গন্ধ প্রভৃতির নির্দেশ করতে হ'ল লোককে বোঝাতে কোন্‌টি আমগাছ, কারণ বনে হাজার রকমের ফলের গাছ আছে। এমনি ক'রেই গাছপালার বর্ণনার শুরু হ'ল। যাকে আমরা বলি ডেস্‌ক্রিপটিব বটানি। তারপর সেই বনের গাছ বাড়ীর বাগানে জন্মাতে গিয়ে, কিংবা জমিতে চাষ করতে গিয়ে তার বীজ পোঁতা, অঙ্কুরোদ্গম, বড় হওয়া, পুষ্টির জন্য মাটিতে সার দেওয়া, জলসেচন প্রভৃতি গাছের

শরীরপোষণের মোটামুটি উপায় এবং উপাদানগুলি ক্রমশ জানা গেল। এমনি ক'রেই উদ্ভিদবিজ্ঞানের পত্তন হ'ল। ক্রমে মানবের প্রয়োজনীয় গাছপালার সংখ্যা বেড়েই চলল, তখন তাদের শ্রেণী বিভাগেরও দরকার হয়ে পড়ল, আর উদ্ভিদবিজ্ঞানের ক্রমবিকাশও এগিয়ে চলল।

আমরা হিন্দু দর্শন ও বিজ্ঞানের মূল উৎসের সন্ধান পাই ঋগ্বেদ ও পরবর্তী বৈদিক সাহিত্যে। অন্যান্য বিজ্ঞানের ন্যায় ভারতে উদ্ভিদবিজ্ঞানের পত্তন ও ক্রমবিকাশের ইতিহাসও আমরা সেইখানেই দেখতে পাই।

বৈদিক হিন্দুগণ সভ্য ছিলেন, ঘরবাড়ী বেঁধে গ্রামে নগরে শহরে বাস করতেন তাঁরা। পারিপার্শ্বিক জগৎ থেকে তাঁরা নিজেদের গৃহোপকরণ, আসবাবপত্র, যানবাহনাদির উপাদান, খাদ্যদ্রব্য, ওষুধপত্র সংগ্রহ করতেন। গাছপালা মানুষকে এবিষয়ে সব চাইতে বেশি সাহায্য করত। একটু চিন্তা করলেই দেখা যায় আমাদের খাদ্যদ্রব্য, গৃহোপকরণ, আসবাবপত্র, অশনবসন, ওষুধপত্র সকল প্রকার প্রয়োজনীয় দ্রব্যের বেশির ভাগই আমরা আজও আমাদের প্রতিবেশী গাছপালা থেকে সংগ্রহ করি।

আর্য হিন্দুগণ যখন ভারতবর্ষে পঞ্চনদীর দেশে এসে—সে আজ চার-পাঁচ হাজার বছর আগের কথা—ঘরবাড়ী বেঁধে প্রথম বসবাস আরম্ভ করলেন তখনই খাদ্যদ্রব্যসংস্থান প্রভৃতি বিষয়ে তাঁদের সজাগ হতে হ'ল। মানুষের প্রধান ও প্রত্যক্ষ সঙ্গী উদ্ভিদ। এই উদ্ভিদ থেকেই তাকে তার ঘরদুয়ারের সরঞ্জাম, আহার্যবস্তু, অশনবসনের উপকরণ সংগ্রহ করতে হল। ক্রমে ক্রমে তার এইসব নিত্যব্যবহার্য জিনিসপত্রের উপকরণের সংখ্যা বেড়েই চলল। তারপরে চাষবাসের প্রয়োজন আর্যেরা অনুভব করলেন।

রোজ রোজ বনে জঙ্গলে ঘুরে ফলমূল সংগ্রহ করার হাঙ্গামা থেকে অব্যাহতি পেতে সেইসব গাছপালা বাড়ীর সন্নিকটে লাগাতে গিয়ে বাগানের পত্তন হ'ল। সঙ্গে সঙ্গে চাষবাসের যন্ত্রপাতিও তৈরী হ'ল।

ক্রমে গাছপালার সম্বন্ধে যতই তাঁদের জ্ঞান প্রসার হতে লাগল ততই তাদের নামকরণের, চেনবার ও চেনাবার জন্য তাদের আকৃতি

প্রকৃতির বর্ণনার প্রয়োজন তাঁরা অনুভব করলেন। এই ক'রেই বর্ণনামূলক উদ্ভিদবিদ্যার পত্তন হ'ল।

চাষবাস ও বাগানে ফল ও ফুলের গাছ উৎপন্ন করতে গেলে যে শস্যের বা ফলফুলের চাষ করতে হয়, তাদের জীবন-ইতিহাস জানা দরকার। জমিতে সার দেওয়া, সেই শস্যকে সময়মত বুনা, যত্ন প্রভৃতি করতে গিয়ে শরীরপোষণের সাধারণ নিয়মগুলি ও উপাদানের কথা তাঁদের জানতে হ'ল। এমনি ক'রে উদ্ভিদবিজ্ঞানের আর-এক পর্ব—গাছপালার শরীরপোষণ এবং বংশবিস্তারের উপায়—জানা আরম্ভ হ'ল।

তাঁরা দেখলেন সমস্ত গাছপালার আকৃতি-প্রকৃতি এক রকমের নয়। কেউ বড়ো, কেউ ছোটো, কেউ সবল, কেউ দুর্বল, কেউ মাটিতে লতিয়ে চলে, না হয় কারো ঘাড়ে চেপে উঁচুতে ওঠে। কেউ ফুলফল ধারণ করে, কেউ করে না, ইত্যাদি। কাজেই নিজেদের জানা ও চেনার জন্য গাছপালার একটা শ্রেণীবিভাগ করা উচিত, এবং তখন থেকেই গাছপালার শ্রেণীবিভাগ আরম্ভ হ'ল।

গাছপালার দেহের অংশ, তাদের আকৃতি ও প্রকৃতি, দেহের বর্ণনা, শরীরপোষণের উপাদান ও উপকরণ এবং বংশবিস্তারের উপায়, তাদের শ্রেণীবিভাগ—উদ্ভিদবিজ্ঞানের এই তিনটি শাখার আরম্ভ ও কিয়ৎপরিমাণে বিকাশ আমরা বৈদিক সাহিত্যে দেখতে পাই। উদ্ভিদবিজ্ঞানের প্রথম আরম্ভ হয়েছিল কৃষিবিজ্ঞান ও চিকিৎসাবিজ্ঞানের অতিপ্রয়োজনীয় সহায়ক হিসাবে। আজও ঐ দুই শাস্ত্র অধ্যয়ন করতে গেলে শিক্ষার্থীকে উদ্ভিদবিদ্যা প্রথমে আয়ত্ত করতে হয়।

ভারতবর্ষে মানুষ ও গাছপালার মধ্যে সম্বন্ধ আর্যগণের ভারতবর্ষে আগমনের পূর্বেই আরম্ভ হয়েছিল, তার তথ্য প্রত্নতাত্ত্বিকগণ মাটি খুঁড়ে বের করেছেন, সেটা অতি অল্প হ'লেও ভারতীয় উদ্ভিদবিদ্যার ইতিহাস থেকে সেটাকে বাদ দেওয়া চলে না। তাই পরের অধ্যায়ে সাধারণভাবে তার একটু আলোচনা করছি।

দ্বিতীয় অধ্যায়

প্রাগ্‌বৈদিক যুগ

ভারতবর্ষে মানুষের সঙ্গে তার প্রতিবেশী গাছপালার সম্বন্ধের প্রথম নিদর্শন আমরা পাই বৈদিক যুগের বহু আগে থেকেই। এ বিষয়ে প্রত্নতাত্ত্বিকগণ ভারতবর্ষের নানা স্থান থেকে যে-সমস্ত বস্তু আবিষ্কার করেছেন সেইসব উপকরণ থেকেই এই অধ্যায় লেখা হয়েছে।

প্রাগ্‌বৈদিক যুগের আবিষ্কৃত বস্তু বা নিদর্শনগুলিকে যুগ ও স্তর হিসাবে নবপ্রস্তরযুগ লৌহযুগ এবং মহেঞ্জোদারো-হারাপ্পা যুগে ভাগ করতে পারা যায়। প্রত্যেক যুগেরই এক-একটা ইতিহাস রচনা করা হয়েছে।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব অধ্যাপক ৺পঞ্চানন মিত্র মহাশয় নবপ্রস্তরযুগের স্থান ও আবিষ্কৃত বস্তুগুলি বিশেষভাবে পরীক্ষা ক'রে সিদ্ধান্ত করেন যে, এই যুগের মানব ভবঘুরে স্বভাব ত্যাগ ক'রে ঘর-বাড়ী বেঁধে বসবাস আরম্ভ করেছিল, এবং তাদের আহার্যবস্তুর প্রধান উপকরণ ছিল গাছের ফলমূল এবং চাষ দ্বারা উৎপন্ন শস্য। মধ্য প্রদেশের বেলারী জেলায় এই যুগের সভ্যতার যে নিদর্শন পাওয়া গিয়েছে সেটা বেশ উন্নত ছিল তাতে সন্দেহ নেই। এই যুগের লোক যে চাষবাস করে খেত তার এক নিদর্শন শস্য পেষণের যন্ত্রপাতি। তারা যে তৃণাচ্ছাদিত ঘরে বাস করত তার প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে ছাইগাদার মধ্যে আবিষ্কৃত খড় থেকে। এরা কাঠও ব্যবহার করত; সীতাকুণ্ড পাহাড়ে এই যুগের একখানি অতি সুন্দর ভাবে পালিশ-করা এবং একদিকে চ্যাপ্টা কাঠের টুকরো পাওয়া গিয়েছে। মিঃ কারডু গুণ্টকুলে আর-একখানি দাঁতচিরুনি আবিষ্কার করেন। অধ্যাপক মিত্র মনে করেন নবপ্রস্তরযুগের শেষভাগে কাপড় পরার প্রচলনও ছিল।

লৌহ-যুগের আবিষ্কৃত বস্তু থেকে আমরা কল্পনা করতে পারি সেই যুগের ভারতীয়গণ বনজঙ্গল ছেড়ে উন্নততর ভাবে বাড়ীঘর বেঁধে চাষ-বাস আরম্ভ করেছিল। তাদের কবরখানা খুঁড়ে ধান ও চীনা পাওয়া গিয়েছে। তারা সুতা কাটত এবং কাপড় বুনত, কারণ সুতাজড়ানো মাকু এবং কাপড়ের টুকরাও সেখানে পাওয়া গিয়েছে। তারা মাটির বাসন-কোসন একপ্রকার গাছের রস দিয়ে পালিশ ও চক্‌চকে করত। মিশর দেশের সঙ্গে তাদের ব্যাবসা-বাণিজ্য ছিল এবং এইসব ব্যাবসার সওদা ছিল আবলুস এবং আবলুসের ন্যায় দামী কাঠ, ধূপধুনাদি সুগন্ধি দ্রব্য, সুরভিত বৃক্ষনির্যাস এবং অনুলেপন দ্রব্যাদি, যার মধ্যে চন্দনও ছিল বলে কেউ কেউ অনুমান করেন।

কিন্তু মহেঞ্জোদারো এবং হারাপ্পা খুঁড়ে যে সমস্ত জিনিস পাওয়া গিয়েছে তা থেকে সিন্ধু উপত্যকায় যে সভ্যতার সন্ধান আমরা পাই, পণ্ডিতগণ অনুমান করেন তার অস্তিত্ব কম করে খৃষ্টপূর্ব আড়াই হাজার বছর আগের। সভ্যতা কতখানি উন্নত ছিল সে সম্বন্ধে সার্ জন মার্শাল বলেছেন—

"One thing that stands out clear and unmistakable both at Mohenjodaro and Harappa that the civilization revealed at these two places, is not an incipient civilization but one already ageold and stereotyped on Indian soil with many millenia of human endeavour behind it."

এই দুই স্থান খুঁড়ে চাষবাসের বহু নিদর্শন পাওয়া গিয়েছে। তার মধ্যে চাষবাসের যন্ত্রপাতি, নানা প্রকার শস্য এবং ফলের বীজ, যথা—যব, গম, চীনা, খেজুর, তরমুজ, তুলা এবং কাপড়ের নমুনা। এই সময় এ প্রদেশে তুলার প্রচুর চাষ হ'ত। অধুনালুপ্ত প্রাচীন ব্যাবিলোনিয়াবাসীরা তুলাকে "সিন্ধু" এবং গ্রীকরা "সিণ্ডন" (sindon) নামে অভিহিত করত। কারণ কাপড় জামা প্রভৃতির

উপাদান হিসাবে তুলার চাষ এবং ব্যবহার সিন্ধুনদীর দেশেই প্রথম আবিষ্কার এবং প্রচলন হয়েছিল।

ঘরবাড়ী তৈরির ও যানবাহনের উপকরণ হিসাবে গাছপালার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধের অন্য নিদর্শনও পাওয়া গিয়েছে। এই সময় গাছপূজা করাও হ'ত। অশ্বত্থগাছ এই সময় থেকেই ভারতবর্ষে উপাসনার বস্তু হিসাবে পূজিত হয়ে আসছে। বহু সীল আবিষ্কৃত হয়েছে যার উপর অশ্বত্থগাছের ছাপ আছে। এ ছাড়া আরও অনেক পবিত্র এবং উপাস্য গাছের ছাপ আছে যাদের মধ্যে খেজুর ও চীনা ছাড়া আর কাউকেই চেনা যায় না। মাটির বাসনপত্র ও হাতের গহনা এক প্রকার গাছের রস দিয়ে পালিশ ও চকচকে করা হ'ত এবং মাটির বাসন নানা প্রকার গাছের নক্‌শা দিয়ে চিত্রিত করা হ'ত। বারোটি সীলমোহরের উপর নানা প্রকার গাছের নক্‌শা আছে, তাদের মধ্যে কেবল বাবুল ও ঝাণ্ডি নিঃসন্দেহে চেনা যায়, বাকিগুলি চেনবার উপায় নেই।

উপরে উদ্ধৃত প্রামাণ্য বস্তুগুলি থেকে আমরা এই কথাই বলতে চাই যে ভারতবর্ষে নবপ্রস্তরযুগ থেকে আরম্ভ ক'রে মহেঞ্জোদারো-হারাপ্পা যুগের প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কারের নিদর্শনগুলি পর্যালোচনা ক'রে ঐ যুগের ভারতীয়গণ বহু গাছপালা এবং তাদের থেকে উৎপন্ন জিনিসের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। ব্যাবসা-বাণিজ্যের প্রধান উপকরণ ছিল ক্ষেত্রে উৎপন্ন শস্যাদি ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় গাছপালা—যাদের সংখ্যা উত্তরোত্তর বেশি হয়েই চলেছিল—এদের নামকরণ, বংশবিস্তারের ধারা, প্রত্যেকটির আকৃতি-প্রকৃতির একটা চলনসই বর্ণনা, ফসল বাড়ানো এবং ভালো গাছ জন্মানোর জন্য জমিতে উপযুক্ত সার দেওয়া ইত্যাদি বিষয়গুলি ক্রমশই জানবার বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল।

এইভাবে মানবসভ্যতার একটি অত্যাবশ্যক অধ্যায় হিসাবেই ভারতবর্ষে প্রাগৈতিহাসিক যুগে উদ্ভিদবিজ্ঞানের আরম্ভ হয়।

তৃতীয় অধ্যায়

বৈদিক যুগ

এই যুগের ভারতীয় সমাজ, সভ্যতা ও তার অবদানের ইতিবৃত্ত আমরা বৈদিক সাহিত্যে পাই, এখানে আমাদের অনুমান করার দরকার হয় না।

বৈদিক হিন্দুগণ গ্রামে, শহরে, শহরতলীতে বাড়ীঘর বেঁধে শান্তিময় জীবন যাপন করতেন। তাঁদের খাদ্যের প্রধান উপকরণ ছিল যবাদি শস্য, ডাল, তরিতরকারি, ফল, দুধ ও দুগ্ধজাত সামগ্রী। সুনিয়ন্ত্রিত চাষবাসের ফলে এত প্রচুর শস্য উৎপন্ন হ'ত যে আতিথেয়তা একটি অতি পুণ্যের কাজ ব'লে গণ্য হ'ত। যাঁর বাড়ী থেকে অতিথি বিমুখ হয়ে ফিরে যেত তাকে লোক ঘৃণা করত। তাঁদের পানীয়ের উপাদান সংগ্রহ হ'ত সোমলতা ও শস্য থেকে।

তাঁরা জামা কাপড় পরা সভ্যতার অঙ্গস্বরূপ মনে করতেন। শতপথব্রাহ্মণে (২৯।৬) আছে—প্রত্যেক সভ্য মানবকে কাপড় জামা পরতে হবে। তখন ঘরে ঘরে তাঁত ছিল। কাপড় জামা বুনা ও তৈরি করা একটি অবশ্যকরণীয় কর্মের মধ্যে গণ্য হ'ত, সঙ্গে সঙ্গে কাপড় ধোলাই করার ব্যবস্থাও ছিল। তাঁরা কাঠের পাদুকা ব্যবহার করতেন এবং দেহের শোভা বাড়াতে ফুলের মালা পরতেন।

বাড়ীঘরের সাধারণ আসবাবপত্রের উপাদান ছিল কাঠ, বেত, নল। যানবাহনের মধ্যে ছিল রথ, শকট ; সমুদ্রে পাড়ি দিতে বড়ো বড়ো নৌকা (নাউ) এবং নদীপথে চলতে ছোটো ছোটো নৌকা (প্লব)। বৈদিক সাহিত্যে অনেকগুলি শব্দ আছে, যথা—ক্রয়-বিক্রয়, পণ্যপণি, বস্ন, শুল্ক ইত্যাদি, যা' থেকে আমরা জানতে পারি বৈদিক হিন্দুগণ ব্যবসা-বাণিজ্য ক'রে প্রভূত অর্থোপার্জন করতেন, এবং অধিকাংশ পণ্য ছিল গাছপালা থেকে উৎপন্ন দ্রব্য। এই সময় নানা কারিগর ও

শিল্পী সম্প্রদায় গ'ড়ে উঠেছিল, যেমন রথকার, কৃষক, ছুতার প্রভৃতি, যারা এক-একটি শিল্প দ্বারা জীবিকা উপার্জন করত। ক্রয়-বিক্রয়ের জিনিসের ওজন ও পণ গাছের ফল দিয়ে হ'ত, যথা—কৃষ্ণল, মাষা, মাষক, কার্ষাপণ ইত্যাদি।

বৈদিক হিন্দুর অবসর সময় কাটত পাশা খেলে, বীণা বাজিয়ে, না হয় অন্যান্য প্রকার গান-বাজনা ক'রে কিংবা শিকার ক'রে। তাঁদের আত্মরক্ষা এবং আক্রমণের অস্ত্রশস্ত্র ছিল ছোরা, বর্শা, বল্লম, তীর, ধনুক প্রভৃতি, যাদের প্রত্যেকেরই কোনো না কোনো অংশ গাছপালার অংশবিশেষ দিয়ে তৈরি হ'ত।

বৈদিক যুগে কৃষিকার্য সর্বপ্রধান পেশা বা বৃত্তি ব'লে গণ্য হ'ত। উপজীবিকার এই ছিল প্রথম ও প্রধান অবলম্বন। জমিতে বারে বারে লাঙ্গল দেওয়া, জমি পতিত রেখে কিংবা পর্যায় ক্রমে বিভিন্ন শস্য বপন করার পদ্ধতি অনুসরণ ক'রে জমির উর্বরাশক্তি বৃদ্ধি করার উপায়গুলি তাঁরা জানতেন। গবাদি পশুর বিশেষভাবে যত্ন করা হ'ত। শস্যের কীটাদি শত্রুর একটা খুব বড়ো ফর্দ পাই এবং সেগুলির বিনাশ করার ব্যবস্থার কথাও জানতে পারি।

বাগান কিংবা পার্ক তৈরি ক'রে সর্বসাধারণের ব্যবহারার্থে উৎসর্গ করা অত্যন্ত পুণ্যকার্য ব'লে গণ্য হ'ত। এ ছাড়া ভিষক্‌ ব'লে এক শ্রেণীর বৈদিক হিন্দু ছিলেন, বর্তমান চিকিৎসকদের মতো যাঁদের কাজ ছিল উদ্ভিদজাত ভেষজের প্রয়োগ করে ব্যাধির চিকিৎসা করা। এ বিষয়ে তাঁরা কৃতজ্ঞ অন্তঃকরণে গাছপালাকে উদ্দেশ ক'রে বলতেন—শতং বো অবং ধামানি সহস্রমুত বো রুহঃ। অধাশতক্রত্বা যূয়মিমং মে অগদং কৃত ॥

"Mother (of mankind), hundred are your applications, a thousandfold is your growth, do you who fulfil a hundred functions make this my (people) free from diseases".—*Rigveda x. 97. 2.*

উপরে বৈদিক সমাজের ও ব্যবহারিক জীবনের যে চিত্র এঁকেছি সেটা অতি সম্পূর্ণ চিত্র মনে করলে ভুল করা হবে। আমাদের উদ্দেশ্য এই প্রমাণ করা যে, বৈদিক হিন্দুগণের উদ্ভিদবিদ্যা চর্চা করার প্রভূত কারণ বিদ্যমান ছিল। এ বিদ্যার আরম্ভ হয়েছিল প্রাগ্‌বৈদিক যুগে। বৈদিক যুগে সেই বিদ্যা কতখানি প্রসার লাভ করেছিল তার একটা হিসাব এখন দেওয়ার চেষ্টা করব।

হিন্দুগণ গোরুর উপকারিতা উপলব্ধি ক'রে যেমন গাভীকে মায়ের তুল্য সম্মান করেন তেমনি আমাদের পুর্বপুরুষগণ গাছপালার ঋণ স্বীকার ক'রে তাদের উদ্দেশ ক'রে বলতেন :

ওষধীরিতি মাতরস্তদ্বো দেবীরূপ ব্রুবে ॥

Plant ! Thus I hail thee, the Divine Mother of mankind.—*Rigveda x. 97. 4.*

ঋগ্বেদে ৪৪টি গাছের নাম ও কিছু কিছু বর্ণনা আছে ; অথর্ববেদে আছে ১০৭টি গাছের নাম, সাধারণভাবে এদের বর্ণনা ও শ্রেণীবিভাগ। এ ছাড়া কৃষিকার্য, ফুল ও ফলের গাছ ভালো ভাবে উৎপন্ন করা, তাদের বংশবিস্তার করতে জমিতে সার দেওয়া, গাছের খাদ্য প্রস্তুতের জন্য সূর্যের আলোর প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধেও বৈদিক ঋষিগণ জানতেন। এ কথা ভাবতে আনন্দ হয় যে যখন পৃথিবীর অন্যান্য দেশের লোকে এসব বিষয়ে অন্ধকারে ছিল তখন আমাদের পূর্বপুরুষগণ বিজ্ঞান আলোচনা ও তার ব্যবহারিক প্রয়োগ সম্বন্ধে অনেকখানি এগিয়ে গিয়েছিলেন।

আধুনিক উদ্ভিদবিদ্যাকে অনেকগুলি শাখায় ভাগ করা হয়েছে। আমরাও সেই ভাগ বজায় রেখেই বৈদিক যুগের উদ্ভিদবিদ্যার আলোচনা করব। শাখাগুলি এই : ১. গাছপালার অঙ্গসংস্থান অর্থাৎ দেহের আকৃতি ও প্রকৃতির বর্ণনা। ২. গাছের শরীর পুষ্টি। ৩. শ্রেণীবিভাগ। এবং ৪. বিবিধ।

১. উদ্ভিদের আকৃতি ও প্রকৃতির বর্ণনা
অঙ্গসংস্থান : Morphology

সমস্ত প্রকার শস্যকে বলা হ'ত ধান্য, শস্য এবং ধানা। বৃহদারণ্যক উপনিষদে (৬।৩।২২) দশ প্রকার শস্যের (গ্রাম্যানি) নাম আছে, যথা—ব্রীহি, যব, তিল, মাষা, অণু, প্রিয়ঙ্গু, মসূর, গোধূম, খল্ব, খলকুল। কোনো গাছের বীজকে সেই গাছের ধান্য বলা হ'ত, যেমন শমীধান্য। অন্যান্য কয়েকপ্রকার শস্যের নাম আছে, যথা—মসূস্য, নাম্ব, অম্ব প্রভৃতি। কিন্তু এদের এখন চেনা যায় না।

অথর্ববেদে তণ্ডুল (১০।৯।২৬) এবং তুষ (৯।১৬।১৬) এ-র ব্যবহার প্রথম দেখতে পাই। সতুষ ধানকে অকর্ণ এবং চালকে কর্ণ বলা হ'ত (তৈত্তিরীয় সংহিতা ১।৮।৯৩), এ ছাড়াও শস্যের গাছ ও কণার উল্লেখে পলাব, পরষ, পূন্ন এবং পুল্য শব্দের ব্যবহার দেখতে পাই।

বৃক্ষ বুঝাতে, বৃক্ষ, বন এবং দ্রুম; বিশাখা শব্দে বিস্তারিত শাখা-প্রশাখাবিশিষ্ট গুল্ম, ওষধি এবং সস শব্দে মানুষের প্রয়োজনীয় ছোটো ছোটো গাছপালা, বীরুৎ শব্দে সাধারণ ছোটো ছোটো গাছ বুঝাত। যে গাছ বা বৃক্ষের শাখাপ্রশাখা ক্রমশবিলীয়মান তাদের অংশুমালী, ঝোপ গাছকে স্তম্বিনী এবং লতাকে ব্রততী, প্রতানবতী, মাটির উপর শয়ান গাছকে অলসালা, এবং ঘাস জাতীয় গাছকে তৃণ বলা হ'ত।

যে গাছের মাত্র একটি পাতা তাকে একশুঙ্গ, যে প্রসারিত তাকে প্রস্তৃণতী, যার ফুল ফোটে তাকে প্রসূবরী, প্রস্বরভী, যার ফল হয় তাকে ফলিন, ফলবতী, নূতন শাখাপল্লবকে তূল, তোকমন, ঘাসের নূতন শীষকে শষ্প, নূতন ডালপালাকে প্রসূ, এবং খুব তাড়াতাড়ি যে ধানের গাছ বাড়ে তাকে প্লাশুক বলা হ'ত।

গাছের দেহের অংশের বর্ণনায়—যার কাণ্ড আছে তাকে কাণ্ডিন, শতকাণ্ড (দূর্বা), শাখা, স্কন্ধ, স্তপ, শিখণ্ডিন ব্যবহার করা হ'ত। ডালপালা বর্ণনায় বল্‌শ এবং শতবল্‌শ কথা দুটি পাই।

দেহের বর্ণনায় বর্ণ-হিসাবে পাই হিরণ্যবর্ণ, হরি, অরুণ, বভ্রু ; এবং কাঁটা থাকলে কণ্টক ; পাতার বর্ণনায় পর্ণ, সহস্রপর্ণ, চিত্রপর্ণ ; লোম থাকলে লোমশ-বসন এবং পাতাহীন নেড়া গাছকে করীর বলা হয়েছে।

গাছের শিকড়কে বলা হ'ত মূল, ঘাসের গোছা মূলকে ভূরিমূল, বটগাছের ঝুলে পড়া শিকড়কে বয়া, পদ্মের মূলকে শালুক, এবং ঐ তন্তুকে বিস বলত।

ফুলকে পুষ্প, ফুলের গাছকে পুষ্পবতী, প্রসূবরী, প্রস্থরভী—ফুলের গুচ্ছের বর্ণনায় স্তম্ব, শিমুলের ফুলকে শিম্বল বলত।

গাছের ফলের বর্ণনায় ফল, ফলের গুচ্ছকে ফলিন, ফলবতী, বৃক্ষ্য (বৃক্ষের ফল), বিশিষ্ট ফলকে পিপ্পল, পিপ্পলী (বহুবচন), শশা-কুমড়ার ফলকে উর্বারু এবং বীজকে বীজ, যেমন ধান্যবীজ (ঋগ্বেদ ৫।৫৩।১৩)।

গাছের দেহের ভিতরের সূক্ষ্ম গঠন দেখা ষোড়শ শতাব্দীর আগে সম্ভব ছিল না। কিন্তু স্থূলভাবে একটা বর্ণনা পাই যেটা থিওফ্রেসটসের বর্ণনার চাইতে অনেক সম্পূর্ণ, যদিও পাশ্চাত্য ঐতিহাসিক থিওফ্রেসটস্‌কেই উদ্ভিদের শারীরস্থানের জনক ব'লে ধ'রে নিয়েছেন। ঋগ্বেদে কাঠকে দারু, তৈত্তিরীয় সংহিতায় দারুর বাইরের অংশকে বল্ক (২।৫।৩।৫) এবং তার ভিতরের অংশকে বকল (৩।৭।৪।২) বলা হয়েছে। কোনো গাছের বল্কলকে সেই গাছের নামের সঙ্গে যুক্ত ক'রে বলা হ'ত, যেমন পর্ণবল্ক (পলাশের ছাল)। ইহার পরবর্তী সংহিতায় (কাঠক) কাঠের বর্ণনায় ক্রুমুক এবং ক্রমুক দেখতে পাই (১৯।১০)।

কিন্তু গাছের দেহের অভ্যন্তরের একটা সম্পূর্ণ বর্ণনা পাই বৃহদারণ্যক উপনিষদে (২৩৪।২৮।১ ; ২৩৬।৩০।৩)— বাহিরে শুষ্ক ত্বক্‌, তার ভিতর নরম শকর, শকরের ভিতর কিনাট (তন্তু), তারপর দারু এবং দারুর ভিতর মজ্জা। আর থিওফ্রেসটস্‌ বলেছেন—উদ্ভিদের অভ্যন্তর বল্কল (phloios), দারু (zylon) এবং মজ্জা (metra) দ্বারা গঠিত।

গাছের দেহের বর্ণনা করেই তাঁরা ক্ষান্ত হন নি। কোনো বিশেষ গাছবহুল স্থানকে সেই গাছের নামে নির্দেশ করেছেন, যেমন নড়্‌বলা, (বাজসনেয়ী সংহিতা ৩০।১৬), শিপাল্য (অথর্ব বেদ ৬।১২।৩, ষড়বিংশ ব্রাহ্মণ ৩।১)

২. গাছের শরীরপুষ্টি : Nutrition

বৈদিক সাহিত্যে গাছের শরীরপুষ্টি জ্ঞানের নমুনা বিশেষ ভাবে না পেলেও যা পাই, সেই যুগের কথা মনে করলে সেটাও বড়ো কম নয়।

বৃহদারণ্যক উপনিষদে (৪।৬।১) উল্লেখ আছে, জলের সার অংশ গাছে সঞ্চারিত হয়, যেমন তৃণ, লতা প্রভৃতি, গাছের সার ফুল, ফুলের সার ফল এবং বীজে সঞ্চারিত হয়, যেমন গম প্রভৃতিতে। গাছের পুষ্টিসাধনে মাটিতে গোবর সার (করীষ, সকৃৎ) দেওয়ার রীতি (ঋগ্বেদ ১।১৬১।১০ ; অথর্ব বেদ ৩।৩।৪, ১৯।৩১।৩, ১২।৪।৯ ; তৈত্তিরীয় সংহিতা ৭।১।১৯।৩) জানা ছিল। জমির উর্বরাশক্তি বৃদ্ধি করতে জমি পতিত রাখা এবং একই জমিতে পর্যায়ক্রমে গম প্রভৃতি এবং ডাল উৎপন্ন করা বৈদিক হিন্দুরাই প্রথম আবিষ্কার করেন (তৈত্তিরীয় সংহিতা ৫।১।৭।৩)।

অধ্যাপক ভীম চট্টোপাধ্যায় মনে করেন, সবুজ গাছ সূর্যকিরণের সাহায্যে খাদ্য প্রস্তুত ক'রে শরীরের মধ্যে সৌরশক্তিকে সঞ্চয় করে, তার ইঙ্গিত নিম্নের ঋগ্বেদের দুইটি মন্ত্রে পাওয়া যায়—

অপ্‌স্বগ্নে সধিষ্টব সৌষধীরনুরুধ্যসে গর্ভে সঞ্জায়সে পুনঃ (৮।৪৩।৯)। ত্বে অগ্নে বিশ্বে অমৃতাসো অদ্রুহ আসাদেবা হবিরদন্ত্যাহুতম্॥ ত্বয়া মর্তাসঃ স্বদন্ত আসুতিং ত্বং গর্ভো বীরুধাং জজ্ঞিষে শুচিঃ (২।১।১৪)।[১]

ঋগ্বেদ ও বৃহদারণ্যক উপনিষদের উক্তি যদি একত্র করি তবে চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের অনুমান যথার্থ ব'লেই মনে হয়।

১ অগ্নাবোষধিষু চ তেজোনিধায় রবিরস্তং যাতীতি আগমঃ।
দিনান্তে নিহিতং তেজঃ সবিত্রেব হুতাশনঃ॥—মল্লিনাথ

গাছের পাতা দিয়ে যে শরীরের জল বা রস বাষ্পাকারে বার হয়, তার আভাস বৃহদারণ্যক উপনিষদে (২৩৪।২৮।১) পাওয়া যায়। সেখানে বলা হয়েছে মানবশরীরের ত্বকে লোমকূপের কাজ গাছের পক্ষে তার পাতা নির্বাহ করে। গাছের রসকে রক্তের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে এবং মানবদেহ কেটে গেলে যেমন রক্তস্রাব হয় তেমনি গাছের দেহ আঁচড়ালে রসশ্রুতি (নির্যাস) হয় (বৃহদারণ্যক উপনিষদ ২২৫।২৯।২)।

গাছের উপর অতিবৃষ্টি ও অনাবৃষ্টির পরিণামের কথা বৈদিক সাহিত্যে উল্লেখ আছে। গাছের শত্রু হিসাবে বহু পোকামাকড়ের তালিকা এবং তাদের প্রতিকারের ব্যবস্থার কথাও আছে (কৌশিক সূত্র ৫০।১৭, ৫১।১৭-২২)।

ক্রমবিকাশের ধারণা এবং মানবের আগে উদ্ভিদের পৃথিবীতে উদ্ভব তৈত্তিরীয় সংহিতায় (২।১) বলা হয়েছে। আত্মা থেকে আকাশ, আকাশ থেকে বায়ু, বায়ু থেকে অগ্নি, অগ্নি থেকে জল, জল থেকে পৃথিবী ; পৃথিবীতে প্রথম আগমন উদ্ভিদের, এবং পরে মানবের উদ্ভব। ঋগ্বেদে আছে—যা ওষধীঃ পূর্বা যাতা দেবেভ্যস্ত্রীযুগং পুরা।

৩. গাছের শ্রেণীবিভাগ : **Classification**

গাছের সংখ্যা যখন বেশি হ'ল তখন তাদের নামকরণ এবং শ্রেণীবিভাগের প্রয়োজন দেখা দিল। ঋগ্বেদে গাছপালাকে তিন শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে, যথা—বৃক্ষ, ওষধি এবং বীরুৎ। প্রকৃতি হিসাবে আবার এদের ভাগ করা হয়েছে বি-শাখা, সস, ব্রততী, প্রতানবতী, অলসালা। সমস্ত ঘাসজাতীয় উদ্ভিদকে তৃণ, যারা ফুল ধারণ করে তারা পুষ্পবতী ও প্রসূবরী, ফলবান গাছকে ফলবতী এবং পাতাহীনকে করীর পর্যায়ে ভাগ করা হয়েছে।

অথর্ববেদে সসকে প্রস্তৃণতি, একশুঙ্গ, অংশুমতী এবং কাণ্ডিনী হিসাবে ভাগ করা হয়েছে।

এইবার গাছের দেহের একটি সম্পূর্ণ বিবরণ এখানে উদ্ধৃত করব। অথর্ববেদে (৮।৭।১২-২৭) গাছের দেহকে ভাগ করা হয়েছে মূল, অগ্র, কাণ্ড, পত্র, ফুল এবং ফল অংশে। কিন্তু তৈত্তিরীয় (৮।৩।১৫।১) এবং বাজসনেয়ী সংহিতায় (২২।২৮) আরও বিশদভাবে দেহের পরিচয় আছে—মূল, তুল, কাণ্ড, বৎস, পুষ্প, এবং ফল। এ ছাড়া বৃক্ষে আছে স্কন্ধ, শাখা এবং পর্ণ (ঋগ্বেদ ১।৩২।৫ ; অথর্ব বেদ ১০।৭।৩৮)।

সমসাময়িক কেন, তার অনেক পরেও কোনো জাতির সাহিত্যে কাব্যে এত বিশদভাবে গাছের দেহ প্রভৃতির বর্ণনার উল্লেখ পাই না।

চতুর্থ অধ্যায়

উত্তর-বৈদিক যুগ—১

বৈদিক সাহিত্য আলোচনা ক'রে আমরা দেখি উদ্ভিদবিদ্যার আরম্ভ হয় কৃষি ও চিকিৎসা বিদ্যার আনুষঙ্গিক হিসাবে। কৃষি ও চিকিৎসার প্রধান উপকরণ গাছপালা। সুতরাং সেই গাছপালা সম্বন্ধে বিশেষভাবে জানতে গিয়েই উদ্ভিদবিদ্যার আরম্ভ এবং প্রসার হয়।

আমরা চিকিৎসাবিদ্যার পরিণতি দেখতে পাই চরক এবং সুশ্রুত সংহিতায়। কৃষিবিজ্ঞানের অন্য কোনো প্রামাণিক গ্রন্থ বিদ্যমান না থাকলেও কৃষিপরাশর বা কৃষিসংগ্রহ নামে একখানি গ্রন্থ আছে। খনার বচন ব'লে কতকগুলি কৃষিসম্বন্ধীয় প্রবাদবচনও এ দেশে প্রচলিত আছে। প্রাচীন সাহিত্যে কৃষিতন্ত্রের বহু উল্লেখ আছে। আবার শার্ঙ্গধর পদ্ধতিতে "অথ বৃক্ষায়ুর্বেদ" নামে একটি অধ্যায়ে "উপবন-বিনোদ" নামে উপ-অধ্যায় আছে। উপবনবিনোদে বৃক্ষবাটিকা নির্মাণ উপলক্ষ ক'রে উদ্ভিদবিদ্যার অনেক কথাই বলা হয়েছে। তা হ'লে আমরা ধ'রে নিতে পারি উদ্ভিদবিদ্যাও কৃষিতন্ত্র এবং চিকিৎসাতন্ত্রের সঙ্গে সঙ্গে প্রসার লাভ করেছিল এবং সেই বিদ্যার কোনো নিদর্শন পৃথক রচিত গ্রন্থে না পেলেও অন্যান্য প্রাচীন গ্রন্থে উল্লেখ পাই।

বৃহৎসংহিতা এবং অগ্নিপুরাণ দুখানিই প্রাচীন প্রামাণিক গ্রন্থ। এই দুখানি গ্রন্থেই[১] বৃক্ষায়ুর্বেদ নামে একটি করে অধ্যায় আছে। কৌটিল্য অর্থশাস্ত্রে[২] সীতাধ্যক্ষ অর্থাৎ কৃষিবিভাগীয় অধ্যক্ষ ও তাঁর সহকারিগণের কর্তব্যাকর্তব্য নির্ধারণ সম্বন্ধীয় অধ্যায়ে "গুল্মবৃক্ষায়ুর্বেদ" কথাটির উল্লেখ আছে। বৃক্ষায়ুর্বেদ এবং গুল্মবৃক্ষায়ুর্বেদ যে একই অর্থে ব্যবহৃত

১ অগ্নিপুরাণ ২৮৩ অধ্যায়; বৃহৎসংহিতা ৫৪ অধ্যায়।

২ ২২৪ অধ্যায়।

হয়েছে সেটা অনুমান করা যেতে পারে। বৃক্ষ কিংবা "গুল্মবৃক্ষ" যে সমস্ত উদ্ভিদজাতিকে ধ'রেই বলা হয়েছে সেটা আমরা নিঃসংশয়ে ধ'রে নিতে পারি। প্রমাণস্বরূপ, ঋগ্বেদে (১০।৮১।৪) বনম্ এবং বৃক্ষ একই অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে উল্লেখ করা যেতে পারে।

উপরোক্ত তিনখানি গ্রন্থের মধ্যে কৌটিল্য অর্থশাস্ত্র রাজনীতি ও অর্থনীতির, বৃহৎসংহিতায় জ্যোতির্বিজ্ঞান এবং হোরা-বিজ্ঞানের বাস্তব জীবনে ব্যবহার, এবং অগ্নিপুরাণে সমস্ত জ্ঞাতব্য বিষয়ের কথা লিখিত হয়েছে। এদের কোনোখানিই উদ্ভিদবিদ্যাবিষয়ক পুস্তক নয়। আবার বৃক্ষায়ুর্বেদ অধ্যায় লিখতে গিয়ে এদের লেখক তিনজনে ঠিক একই কথা বলেন নি। বৃহৎসংহিতা এবং অগ্নিপুরাণে বৃক্ষের রোগ এবং তার প্রতিকার বিষয়ে বিস্তৃত ব্যবস্থা আছে। বৃহৎসংহিতায় গাছের বংশ-বৃদ্ধির নানাপ্রকার উপায়ের নির্দেশও আছে। অর্থশাস্ত্রে এ সব বিষয়ের কোনো উল্লেখ নেই। অথচ অর্থশাস্ত্র কেবল যে অতি পুরাতন প্রামাণিক গ্রন্থ তাই নয়, এতে "বৃক্ষায়ুর্বেদ" এবং কৃষিতন্ত্র দুটি বিভিন্ন ও স্বতন্ত্র জ্ঞানবিভাগ হিসাবে উল্লিখিত হয়েছে, যথা—

সীতাঽধ্যক্ষ কৃষিতন্ত্র গুল্মবৃক্ষায়ুর্বেদজ্ঞস্তজ্‌জ্ঞসখো বা সর্বধান্য পুষ্পফল-শাককন্দমূলপালীক্যক্ষৌমকার্পাসবীজানি যথাকালং গৃহ্ণীয়াৎ॥

উপরে উদ্ধৃত বাক্যে বোঝা যায় যে, কৃষিবিভাগের অধ্যক্ষ এবং তাঁর সহকারিবৃন্দকে কৃষিতন্ত্র ও গুল্মবৃক্ষায়ুর্বেদ (গুল্মবৃক্ষাদির জীবনবিষয়ক জ্ঞান—উদ্ভিদবিজ্ঞান) আয়ত্ত ও তাদের ব্যবহারিক বিষয়ে প্রয়োগ করায় অভিজ্ঞ হতে হ'ত। কৃষিতন্ত্র এবং বৃক্ষায়ুর্বেদ দুইটি স্বতন্ত্র জ্ঞানবিভাগ হ'লেও পরস্পর ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত ছিল। কেননা কৃষিতন্ত্রের বিষয়ই হচ্ছে বৃক্ষলতাগুল্মাদি নিয়ে। এ থেকে আমরা এই সিদ্ধান্ত করতে পারি যে, আধুনিক কৃষিবিজ্ঞান-শিক্ষার্থীর মতো প্রাচীনকালের শিক্ষার্থীকেও আগে উদ্ভিদবিজ্ঞান শিখে নিতে হত, নতুবা তার শিক্ষা সম্পূর্ণ হত না।

কিন্তু অগ্নিপুরাণ ও বৃহৎসংহিতায় কৃষিতন্ত্রের উল্লেখমাত্রও নেই।

এই তিনখানি সর্বসাধারণের জন্য লিখিত পুস্তকেই মুখ্যতঃ উদ্ভিদবিজ্ঞানের নিত্যব্যবহার্য কয়েকটি বিষয়ের কথা লিপিবদ্ধ আছে। এখন প্রশ্ন এই যে, উপরোক্ত গ্রন্থত্রয়ের রচয়িতৃগণ বৃক্ষাদি সম্বন্ধে কতকগুলি নিত্যকরণীয় বিষয়ের উল্লেখ ক'রেই বৃক্ষায়ুর্বেদ-বিজ্ঞান শেষ করেছিলেন কি না! আমরা বলব, না, শেষ করেন নি। এই যে তিনখানি অনুদ্ভিদবিষয়ক গ্রন্থে তিনটি অধ্যায় লিখিত হয়েছে এতে স্পষ্টই মনে হয় যে, যেহেতু এই গ্রন্থ তিনখানির রচনার কাল বহু শতাব্দী পরে পরে, তখন এমন কোনো গ্রন্থ ছিল যাতে বৃক্ষাদির জীবন-ইতিহাস সবিস্তারে লেখা ছিল। আমাদের দুর্ভাগ্যবশত সেই গ্রন্থ হয় নষ্ট হয়েছে, না হয় আজও আবিষ্কৃত হয় নি।

তবে কি উদ্ভিদবিজ্ঞান কেবলমাত্র কৃষিতন্ত্রের সঙ্গেই উৎকর্ষ লাভ করেছিল? এ প্রশ্নের জবাব দিতে গেলে আমাদের দেখতে হবে উক্ত যুগে এমন কোনো গ্রন্থের উল্লেখ পাওয়া যায় কি না যাতে কেবলমাত্র কৃষিবিজ্ঞান কিংবা উদ্ভিদবিজ্ঞানের কথা বলা হয়েছে।

বৃহৎসংহিতার টীকাকার ভট্টোপাল বৃক্ষায়ুর্বেদ অধ্যায়ের টীকায় আরও তিন জন লেখকের মত উদ্ধৃত করেছেন—কাশ্যপ, পরাশর এবং সারস্বত। আমাদের মনে হয় এঁরা তিনজনেই কৃষিবিজ্ঞান বিষয়ে পুস্তক রচনা করেছিলেন, কারণ কৃষিপরাশর নামে একখানি কৃষিতন্ত্রীয় অতি উপাদেয় গ্রন্থ আজও বিদ্যমান। এঁরা কিন্তু কৃষিবিজ্ঞান ও উদ্ভিদবিজ্ঞান (বৃক্ষায়ুর্বেদ) একই অর্থে কোথাও ব্যবহার করেন নি। বরং অগ্নিপুরাণ ও বৃহৎসংহিতায় বৃক্ষের রোগ এবং তার প্রতিকার উদ্ভিদবিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত ব'লে উল্লেখ করেছেন।

ঋগ্বেদ, অথর্ববেদ ও চরকসংহিতা প্রভৃতি আয়ুর্বেদশাস্ত্র পাঠে আমরা জানতে পারি যে, আয়ুর্বেদ এবং উদ্ভিদবিজ্ঞান অতি নিকটসম্পর্কীয়। ঋগ্বেদে উদ্ভিদের ১০৭ রকম রোগনিবারণী শক্তির উল্লেখ আছে (১০।৯৭)। অথর্ববেদেও বিভিন্ন প্রকারের বহু বৃক্ষলতাগুল্ম প্রভৃতির বর্ণনা, শ্রেণী-বিভাগ ও তাদের রোগনিবারণ করার গুণের প্রশংসা ও উল্লেখ আছে।

কিন্তু ঐ দুই বেদের কোথায়ও কৃষিকার্যে উদ্ভিদবিষয়ক জ্ঞানের ব্যবহারের উল্লেখ বিশেষভাবে দেখা যায় না। প্রচলিত ঔষধ কথাটি ফলপাকান্ত ওষধি (herb) থেকে গৃহীত হয়েছে। এবং দারু শব্দটি কখনো কখনো ঔষধ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এ ছাড়া ভেষজ শব্দ থেকেই ভিষক্‌ শব্দের উৎপত্তি হয়েছে।

চরকসংহিতায় (সূত্রস্থান ১।৫১-৫৩) অতি স্পষ্ট ভাষায় লেখা হয়েছে, "যিনি ওষধিসমূহের নাম ও আকৃতি জানেন এবং গুণকর্মানুসারে তাদের যোগ করতে সমর্থ হন তাঁকেই ওষধি-তত্ত্ববিদ্‌ ভিষক্‌ বলা যায়।" ধন্বন্তরী নিঘণ্টুকার বলেছেন—

একস্ত নাম প্রথিতং বহূনাম্‌।
একস্য নামানি তথা বহূনি॥
দ্রব্যস্য জাত্যাকৃতিবর্ণবীর্য-
রসপ্রভাবাদিগুণৈর্ভবন্তি॥
নামানি বিজ্ঞায় বহূংশ্চপৃষ্ট্বা
দৃষ্ট্বা চ সংস্পৃশ্য চ জাতিলিঙ্গৈঃ
বিদ্যাদ্ভিষগ্‌ ভেষজমাদরেণ॥

"জাতি, আকৃতি, বর্ণ, বীর্য প্রভাবাদি অনুসারে এক দ্রব্যের বহু নাম, ও বহু দ্রব্যের এক নাম প্রথিত আছে। অতএব ভিষক্‌ প্রাকৃত সংস্কৃত বহু নাম জেনে এবং বহু লোককে জিজ্ঞাসা করে, স্পর্শ করে এবং ভেষজের জাতি, লিঙ্গ এবং অন্যান্য লক্ষণাদি বিবেচনা ক'রে সাদরে ভেষজবিদ্যা আহরণ করবেন।"

এখানে আমরা ভেষজবিদ্যা বলতে স্পষ্টভাষায় উদ্ভিদবিদ্যার উল্লেখ দেখতে পাই। এ বিদ্যায় উদ্ভিদের শুধু গুণ ও প্রয়োগ (Materia Medica) শিক্ষাই দেওয়া হ'ত না; তাদের জাতি, আকৃতি, বর্ণ, জাতিলক্ষণাদি প্রভৃতিও শিক্ষণীয় ছিল। আধুনিক মেডিকেল-শিক্ষার্থীদের মতো প্রত্যেক আয়ুর্বেদ-শিক্ষার্থীকে এই বিদ্যা আয়ত্ত করতে হ'ত। প্রমাণস্বরূপ নিম্নলিখিত উদাহরণটি দেওয়া হ'ল—

ভগবান বুদ্ধের চিকিৎসক জীবক তক্ষশিলা বিশ্ববিদ্যালয়ের আয়ুর্বেদাধ্যাপক ভিক্ষু আত্রেয়ের নিকট অধ্যয়ন শেষ ক'রে বিদায় প্রার্থনা করলে ভিক্ষু আত্রেয় জীবকের আয়ুর্বেদাধিকার পরীক্ষার জন্য আদেশ করলেন—তুমি এই বিশ্ববিদ্যালয়কে কেন্দ্র করে চার যোজনের মধ্যে যত গাছপালা আছে সেগুলি সংগ্রহ ক'রে আনো এবং তাদের জাতি, আকৃতি প্রভৃতি নির্ণয় ক'রে প্রত্যেকের গুণ কি, বলো। জীবক তাই করার পর অধ্যাপক তুষ্ট হয়ে তাঁকে বিদায় দিলেন।

আমাদের মন্দভাগ্য যে, বৃক্ষায়ুর্বেদ কিংবা ভেষজবিদ্যার একখানি গ্রন্থেরও সন্ধান আমরা আজও পাই নি। হয় অন্যান্য বহু মূল্যবান গ্রন্থের মতোই সে সব নষ্ট হয়ে গিয়েছে, আর না হয় তাদের আবিষ্কার আজও হয় নি। কিন্তু আমাদের শাস্ত্র-ইতিহাস প্রভৃতি গ্রন্থে উদ্ভিদবিদ্যা সম্পর্কিত বিস্তর উদ্ধৃতি আছে, যা থেকে আমরা পরবর্তী অধ্যায়ে হিন্দু উদ্ভিদবিদ্যার একটা পরিচয় দিতে চেষ্টা করেছি।

পঞ্চম অধ্যায়

উত্তর-বৈদিক যুগ—২

বৃক্ষায়ুর্বেদ কিংবা ভেষজবিদ্যা নামক গ্রন্থের অভাবে আমরা এখানে উদ্ভিদবিদ্যার বিষয়গুলিকে আধুনিক নিয়মে নিম্নলিখিত ভাগে ভাগ ক'রে আলোচনা করব। ১. বীজ ও অঙ্কুরোদ্গম, ২. অঙ্গসংস্থান, ৩ শারীরস্থান, ৪. শারীরবৃত্তি, ৫. বাস্তুসংস্থান, ৬. শ্রেণীবিভাগ, ৭. ক্রমবিকাশ, ৮ বংশানুক্রম, ৯ অনৈসর্গিক উদ্ভিদ, এবং ১০ বিবিধ প্রয়োগ'।

১. **বীজ ও অঙ্কুরোদ্গম**—উদ্ভিদের জীবন-ইতিহাস জানতে গেলে বীজ থেকে চারার জন্ম হ'তে আরম্ভ করা হয়। গরুড়পুরাণে (১:৮।১৭) বীজের একটী সুন্দর পরিচয় দেওয়া আছে—তদ্বিজং যৎ প্ররোহতি। বীজের ভিতর অঙ্কুর (ভ্রূণ) সুপ্ত অবস্থায় থাকে। সেই অঙ্কুরকে জাগিয়ে তোলার নাম অঙ্কুরোদ্গম, অঙ্কুরোদ্ভেদ। এর জন্য অন্ততঃ তিনটি বিষয়ের সংযোগ দরকার—বায়ু, জল আর তাপ। সুশ্রুতে (শারীরস্থান ২।৩৩) এই তিনটির কথা বলা হয়েছে—ঋতুক্ষেত্রাম্বুবীজানাং সামগ্র্যাদঙ্কুরো যথা। আরও বলা হয়েছে ঋতু, উপযুক্ত ক্ষেত্র ও জল ছাড়াও পরিপুষ্ট বীজ এবং যত্ন চাই সতেজ ও ব্যাধিমুক্ত চারা জন্মাতে। ষড়দর্শনসমুচ্চয়ের টীকায় গুণরত্ন বলেছেন—বটপিপ্পলনীম্বাদীনাং প্রাবৃড়্জলধরনিনাদশিশিরবায়ুসংস্পর্শাৎ অঙ্কুরোদ্ভেদঃ। অঙ্কুর মাটি ভেদ ক'রে ওঠে ব'লেই একে অঙ্কুরোদ্ভেদ বলা হয়। এই ব্যাপারে সকলের আগে মূল বার হয়ে মাটিতে প্রবেশ করে বলে ঘটনাটি বোঝাতে আরও দুটি শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে—উত্তানপাদ, উর্ধ্বমূল। সুতরাং বলা যায়, অঙ্কুরোদ্গমে আবশ্যকীয় বিষয়গুলি জানা ছাড়াও ঘটনাটি পর্যন্ত হিন্দুদের জানা ছিল।

২. **অঙ্গসংস্থান**—বৈদিক সাহিত্যে গাছের দেহের বর্ণনার আরম্ভ, এখানে প্রসার ও পরিণতি। অবশ্য একে সম্পূর্ণ পরিচয় বলা উচিত হবে না।

শুক্রনীতিতে গাছের দেহের অংশ এবং তাদের কার্য বড় সুন্দর উপমা দিয়ে বুঝানো হয়েছে—রাজা গাছের মূল, পরিষদ-সভা কাণ্ড, সেনাপতিগণ শাখা-প্রশাখা, সৈন্যদল পাতা ও ফুল, প্রজাবৃন্দ ফল এবং ভূমি বীজ। বিষ্ণুপুরাণে (৭।৩৭-৩৯) ধানগাছের দেহের একটি সম্পূর্ণ বর্ণনা আছে—অঙ্কুর, মূল, নাল, পত্র, পুষ্প, ক্ষীর, তুষ, বীজকোষ, বীজ, তণ্ডুল, কণা (endosperm)। এই সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ উপযুক্ত ক্ষেত্র জল প্রভৃতির সংস্পর্শে প্রকাশিত হয়।

উপরি উক্ত দুটি দৃষ্টান্ত থেকে বোঝা যায় গাছের দেহের অংশ এবং তাদের কার্যাবলী জানা ছিল। বিষ্ণুপুরাণে মাটির নীচের অংশকে মূল, পাদ এবং মাটির উপরের অংশকে বিস্তার বলা হয়েছে। সংস্কৃত সাহিত্যে গাছপালার দুটি বিশেষ নাম পাই—উদ্ভিদ এবং পাদপ। দুটি নামই সার্থক—অঙ্কুরোদ্গমের সময় মাটি ভেদ ক'রে ওঠে এবং পাদ অর্থাৎ মূল দিয়ে মাটির রস পান করে—পাদৈঃ সলিলপানাচ্চ।

মূল—নানাপ্রকার মূলের বর্ণনায় পাই শিফা, জটা, শাখাশিফা, অবরোহ, বয়া, ভূরীমূল, কন্দমূল, শতমুল।

বিস্তার, তূল—কাণ্ড শাখাপ্রশাখা পর্ণ দ্বারা গাছ বিস্তার লাভ করে ব'লে এই অংশকে বিস্তার বলা হয়। প্রকাণ্ড, স্কন্ধ যাদের শক্ত, ও গাছকে দাঁড় করিয়ে রাখে তেমন গাছকে বলা হয় বনস্পতি, বানস্পত্য ; যারা নিজের দেহের উপর ভর করে দাঁড়াতে পারে না তারা বল্লী, ব্রততী, লতা, আরোহ (বল্লী বেষ্টয়তে বৃক্ষং মূঁলাচ্চাগ্রগতা লতা ইত্যাদি), প্রতানিন (শয়ান) প্রভৃতি। কাণ্ড— পর্ব এবং গ্রন্থী কিংবা পর্বসন্ধিতে বিভক্ত। গ্রন্থী থেকে পর্ণ বা পাতা বার হয়। গাছ সকাণ্ড, অপ্রকাণ্ড কিংবা স্তম্ব হ'তে পারে। তাল নারিকেল গাছের ন্যায় শাখাবিহীন গাছকে স্থাণু, শঙ্কু, যে গাছ ঝোপের আকার ধারণ করে তাকে ক্ষুপ (হ্রস্ব-শাখাশিফ) বলে। ডালের উৎপত্তি হিসাবে স্কন্ধ-শাখা, প্রশাখা, অনুশাখা, শাখিন, এবং ডালপালার অঙ্কুরকে প্রবাল, পত্রমুকুল আখ্যা দেওয়া হয়।

কাঁটা সম্পর্কে গাছ অকণ্টক সকণ্টক হতে পারে। আর হতে পারে লোমশ। বিলম্বিনী, যাদের সোত্তিকা (tendril—পালি) থাকে।

গাছের প্রকার—বৃক্ষ, তরু, ওষধি, ক্ষুপ, বীরুৎ, লতা, বল্লী, প্রভৃতি ছাড়াও অন্যান্য প্রকৃতির গাছ জানা ছিল, যেমন পরগাছা—বৃক্ষোপরি বৃক্ষে পরগাছা ইতি খ্যাতে। পরগাছা দুই প্রকার, বৃক্ষারুহা (epiphytes—বৃক্ষে রোহতি ইতি) এবং বৃক্ষাদনী (parasites—অদন) ; গুলঞ্চের মত গাছকে ছিন্নরুহা—ছিন্নাপি রোহতি জায়তে—বলা হ'ত। ব্যাঙের ছাতাকে উদ্ভিদ, ছত্রাক (এদের উৎপত্তিস্থান সুশ্রুতে আছে পলাল, বেণু, ইক্ষু, করীষ প্রভৃতি) ; শেওলাকে শৈবাল, জলনীলী —জলনীলী তু শৈবালং—এবং কিণ্ব (yeast)।

মাটির নীচের কাণ্ডকে বলা হ'ত কন্দ—যন্মূলমেব বীজং স কন্দঃ। উদাহরণ দেওয়া হয়েছে ওল, ছয় রকম আলুক, মূলক, গাজর, কলা, মানকচু, পলাণ্ডু, মহাকন্দ ইত্যাদি।

পর্ন—পর্ণ অর্থাৎ পাতা হরিৎবর্ণ, সবৃন্ত, অবৃন্ত, পল্লব, কিশলয় (নূতন পাতা)। পত্রের খণ্ড হিসাবে একপত্র, দ্বিপত্র, ত্রিপত্র, সপ্তপর্ণ। পাতার আকৃতি হিসাবে—অশ্বপর্ণক, মুষিকপর্ণী, কীশপর্ণী ইত্যাদি।

পুষ্প—কুসুম, প্রসূন, সুমনস্‌ (যে মনকে আনন্দ দেয়), কোরক, কলিকা (ফুলের কুঁড়ি), কুট্মল, মুকুল ; ফোটা ফুল বিকচ, স্ফুটা—বিকসিতং সিতং ; ফুলের গোছা স্তবক, গুচ্ছক, মঞ্জরী, বল্লরী, শ্রীহস্তিনী (helicoid), ছত্রা (umbel) ; ফুলের ডাঁটা প্রসব-বন্ধন। ফুলের আকৃতি বক্রপুষ্প (papilionaceous)। ফুলের অংশেরও কিছু কিছু পরিচয় পাই। বাহিরের অংশকে পুষ্পচ্ছদ, তার ভিতরের পাপড়িকে পুষ্পদল, যেমন শতদল সহস্রদল ; তার পরের অংশ কেশর, কিঞ্জল্ক—যার মাথায় থাকে পরাগরেণু, অন্য নাম সুমনোরজ ; শস্যমঞ্জরী। গর্ভকোষের কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না।

ফল—ফলের প্রকার ভেদে শলাটু (সবুজ), বান (শুষ্ক) ক্ষীরক, জালক (মাংসল), শিম্বী (সিমের মত)। গাছের নাম হিসাবে

ফলের নামকরণ করা হ'ত, যথা—আম্র, জম্বু, ঐঙ্গুগ, বৈনব ইত্যাদি। পালিগ্রন্থে ফলের অংশবিশেষের নাম পাই, যেমন, কুথিলিকা, সিপাটিকা (হিঙ্গুসিঃ—pericarp), পেসী (জম্বুপেশী—rind)।

বীজ—বর্ণনায় পাই বীজকোষ, সস্থ, বীজপত্র, বীজদল।

৩. **শারীরস্থান**—বৈদিক সাহিত্যে যে বর্ণনা আছে তার চাইতে আর বেশি বর্ণনা বড়ো পাওয়া যায় না। দারুর বদলে পাই সার (কালান্তর-মিতি), গুলঞ্চের দেহের বর্ণনায় দেখি চক্রাঙ্গী (scars, lenticels)। শঙ্করমিশ্র তাঁর উপাস্করে (১।২।৫) গাছের ক্ষত সারাতে নূতন কলা-তন্তর (cicatrix tissue) কথা বলেছেন—বৃদ্ধিক্ষতভগ্নসংরোহণে চ। গুণরত্ন তাঁর টীকায় বলেছেন, যথা মনুষ্যশরীরস্যৌষধপ্রয়োগাদ্‌বৃদ্ধিহানি-ক্ষতভুগ্নসংরোহণানি, তথা বনস্পতিশরীরস্যাপি।

৪. **শারীরবৃত্তি** (গাছের আহার ও খাদ্য)—গাছের বীজ থেকে জন্ম ও মৃত্যু পর্যন্ত আহার ও খাদ্য চাই, এ বিষয় সকলেরই জানা থাকলেও গুণরত্ন স্পষ্ট ক'রেই লিখেছেন, ...এবং বনস্পতিশরীরমপি ভূজলাদ্যাহারাভ্যবহারাদাহারকম্‌। তথা, যথা মনুষ্যশরীরমিষ্টানিষ্টাহারাদি-প্রাপ্ত্যা বৃদ্ধিহান্যাত্মকং, তথা বনস্পতিশরীরমপি।

ঋগ্বেদে আমরা দেখেছি গাছের খাদ্য প্রস্তুত ব্যাপারে সূর্যরশ্মির প্রভাব। এই বিষয়েই বিশদভাবে বলা হয়েছে মহাভারতের বনপর্বে (অধ্যায় ৩)[১] —"প্রথমে ভূতসকল উৎপন্ন হইয়া ক্ষুধায় সাতিশয় কাতর হইতে লাগিল, তখন ভূতপ্রসবিতা সূর্য করুণাপরতন্ত্র হইয়া উত্তরায়ণে গমনপূর্বক রশ্মিদ্বারা তেজ ও রস উদ্ধৃত করত দক্ষিণায়ণে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া পৃথিবীতে প্রবিষ্ট হইলেন। রবি ক্ষেত্রভূত হইলে চন্দ্রমা আকাশ হইতে তেজ উদ্ধৃত করিয়া সলিল দ্বারা ওষধি উৎপাদন করিলেন। তদনন্তর বীজসকল নির্গত হইল। সূর্য পরিশেষে চন্দ্রমার তেজোদ্বারা নিষিক্ত ও পবিত্রমধুরাদি রসসম্পন্ন ওষধিরূপে পরিণত হইয়া পার্থিব

১ কালীপ্রসন্ন সিংহের অনুবাদ।

প্রাণিগণের অন্নস্বরূপ হয়েন, এই সূর্য্যাত্মক অন্ন প্রাণিগণের প্রাণধারণের উপায়। অতএব হে রাজন্, সূর্যই সর্বপ্রাণীর পিতা।"

শান্তিপর্বে (অধ্যায় ১৮৪) উদ্ভিদ কর্তৃক খাদ্যপ্রস্তুতের একটি বিবরণ দেওয়া আছে, যা যে-কোন জাতির পক্ষে গর্বের বিষয় হতে পারে। বিবরণটি অতি আধুনিক আবিষ্কারের মূলস্বরূপ ধরা যেতে পারে।

"যেমন মুখ দ্বারা উৎপল নাল গ্রহণ করিয়া জল শোষণ করা যায় তদ্রূপ পাদপগণ পবনসহযোগে মূলদ্বারা সলিল পান করে।[১] বৃক্ষাদি স্থাবর পদার্থ মূলদ্বারা যে জল গ্রহণ করে, অগ্নি ও বায়ু সেই জল জীর্ণ করিয়া থাকে। ঐ জলের পরিপাক হওয়াতেই ঐ সকল স্থাবর পদার্থ লাবণ্যবিশিষ্ট ও পরিবর্ধিত হয়।"

মাটির রস বায়ু এবং অগ্নির সাহায্যে জীর্ণ হয়ে গাছের শরীরকে বর্ধিত ও স্নিগ্ধ করে। ১৭২৭ খৃস্টাব্দে স্টিফেন হেল যা পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণ করেন সেটা সম্ভবত বহু পূর্বে হিন্দু বৈজ্ঞানিক অনুমান করেছিলেন, প্রমাণের অভাবে তার বেশি বলা চলে না। গাছের জীবনে সবুজ পাতার প্রয়োজনীয়তার কথা খনার বচনে পাওয়া যায়— লাগিয়ে কলা না কাট পাত, তাতেই কাপড় তাতেই ভাত।

১৭শ শতাব্দীতে হার্ভে উদ্ভিদের শরীরের ভিতর রসসংবহন প্রমাণ করেন। কিন্তু আমাদের দেশে কণাদ বৈশেষিকদর্শনে (৫।২।৭) এবং শঙ্করমিশ্র তাঁর উপাস্করে এ নিয়ে বহু পূর্বেই আলোচনা ক'রে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন। তাঁরা বলেছেন, গাছের মূলে যে জল সেচন করা হয় সেই জল গাছের দেহের ভিতরে নানাদিকে সংবাহিত হয়। এই ঘটনাকে তাঁরা উৎস্রোতস্ বলেছেন। উৎস্রোত-সস্তমঃপ্রায়া অন্তস্পর্শবিশেষিণঃ। উর্দ্ধং স্রোতঃ আহারসঞ্চারো যেষাম্। ভাগবতপুরাণে ইহার পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে।

১ বক্ত্রেণোৎপলনালেন যথোর্ধ্বং জলমাদদেৎ।
তথা পবনসংযুক্তঃ পাদৈঃ পিবতি পাদপঃ॥

ফল এবং ফুল ভাল ক'রে উৎপন্ন করতে হ'লে মাটির উর্বরাশক্তি বেশি করা দরকার। বৈদিক যুগেই জমি পতিত রেখে এবং শস্যপর্যায়রীতি প্রয়োগ ক'রে এই শক্তি বাড়ানো হ'ত। তার পর অন্যান্য নানা বিধির প্রয়োগ আমরা দেখতে পাই। বৃহৎসংহিতা অগ্নিপুরাণ প্রভৃতিতে এ বিষয়ে অনেক ব্যবস্থা দেওয়া আছে। যেমন গোবর, ছাগলের মলমূত্র, গোমাংস, মাছ ধোয়া জল, দুধ, ঘি, খড়, তিল, বালি প্রভৃতি মিশিয়ে পচিয়ে নানা প্রকার কুণপ জলের (nutrient solution) প্রেসক্রিপশন আছে। গাছের গোড়া খুঁড়ে দেবার ব্যবস্থা আছে। এর ফল সম্বন্ধে এমন কথা লেখা আছে—সিক্তাঃ শোষমুপাগতাশ্চ ফলিনঃ স্নিগ্ধা ভবন্তি স্থিরাঃ। আর এক স্থানে বলা হয়েছে—অনেনৈব চ তৈলেন শুষ্যমানা মহাক্রমাঃ। সিক্তাং পুনঃ প্ররোহন্তি ভবন্তি ফলশালিনঃ।

র স স্রু তি—বৈদিক সাহিত্যে এই ঘটনার উল্লেখ আছে। কিন্তু রাজনিঘণ্টুকার এ সম্বন্ধে বিশেষ ক'রে বলেছেন :

স্যাক্রুদন্তী স্রবত্তোয়া সঞ্জীবন্যমৃতস্রবা।
রোমাঞ্চিকা মহামাংসী চণপত্রী সুধাশ্রবা ॥

অ নু প্র ভা—(Phosphorescence)—রাত্রে অনেক গাছের দেহে প্রভা দেখা যায়, এদের কথাও বৈদ্যকগ্রন্থে এবং কাব্যে লিপিবদ্ধ হয়েছে। ধন্বন্তরীনিঘণ্টুকার এদের বিষয়ে বলেছেন—জ্যোতিষ্মতী তু কটভী সুবর্ণলতিকেতি চ। জ্যোতিষ্কায়াহগ্নিভাসা চ লবণোক্তা চ দুর্জরা। রাজনিঘণ্টুকার বলেছেন—জ্যোতিষ্মতী স্বর্ণলতাহনলপ্রভা জ্যোতির্লতা সা কটভী সুপিঙ্গলা। দীপ্তা চ মেধ্যা মতিদা চ দুর্জরা সরস্বতী স্যাদমৃতার্ক সংখ্যয়া ॥

কুমারসম্ভবে এদের একটি সুন্দর বর্ণনা আছে—

বনেচরাণাং বনিতাসখানাং দরীগৃহোৎসঙ্গনিষক্তভাসঃ।
ভবন্তি যত্রৌষধয়ো রজন্যামতৈলপূরাঃ সুরতপ্রদীপাঃ ॥ ১।১০
তাং হংসমালাঃ শরদীব গঙ্গাং মহৌষধিং নক্তমিবাত্মভাসঃ।
স্থিরোপদেশামুপদেশকালে প্রপেদিরে প্রাক্তনজন্মবিদ্যা ॥ ১।৩০

দে হে র বৃ দ্ধি—গাছের বাল-কুমার-যুব-বৃদ্ধতা পরিণামের কথা সাহিত্যে উল্লেখ আছে। অঙ্কুরোদ্ভেদের পরে ক্রমশ ডালপালা ধারণ ক'রে দেহের বিস্তার জানা ছিল—বনস্পতি শরীরমরকিঙ্কুসলয় শাখা-প্রশাখাদিভির্বিশেষৈঃ প্রতিনিয়তং বর্ধতে ইতি। এবং ইহার জন্য ভূ, জল আহারের দরকার নতুবা বৃদ্ধির ব্যাঘাত ঘটবে। এর জন্য সূর্যের রশ্মি দরকার, সে কথা পূর্বেই বলা হয়েছে।

গাছের বয়স এবং মৃত্যুর কথাও বলা আছে। বয়স গাছ হিসাবে এক মুহূর্ত থেকে দশ হাজার বছর হতে পারে। গুণরত্ন বলেন, দশসহস্রাণ্যুৎকৃষ্টমায়ুঃ। তিনি মৃত্যুর কারণ সম্বন্ধে বলেছেন—ভালো মন্দ আহার, ব্যাধি ও আকস্মিক বিপদ, ইষ্টানিষ্টাহারাদিপ্রাপ্তি ইত্যাদি। উদয়নের কিরণাবলীতেও এই রকমই বলা হয়েছে।

চ ল ন—গাছের চলন আপাতদৃষ্টিতে বোঝা যায় না, উদ্ভিদ এবং প্রাণীর মধ্যে এই চলন একটি প্রধান পার্থক্য। কিন্তু গাছ যদিও "মাটিতে আবদ্ধ জীব," এদেরও অল্পবিস্তর অঙ্গসঞ্চালন আছে। আমাদের সাহিত্যদর্শনে এ বিষয়ে বহু আলোচনা আছে। মহাভারতের শান্তিপর্বে এ বিষয়ে একটি বিশেষ আলোচনা আছে। এখানে সেটি সম্পূর্ণ উদ্ধৃত করা গেল—

"ভরদ্বাজ ভৃগুকে জিজ্ঞাসা করিলেন—ভগবন্, বৃক্ষলতাদি শ্রবণ, দর্শন, আঘ্রাণ, আস্বাদন বা স্পর্শ করিতে পারে না কেন, যদি তারা পঞ্চভূত দ্বারা সৃষ্ট হয়? ভৃগু বলিলেন—যখন প্রতিনিয়ত উহাদের ফলপুষ্পোদ্গম হইতেছে তখন উহাদের মধ্যে আকাশ রহিয়াছে; যখন উত্তাপ দ্বারা উহাদের পত্র, ত্বক, ফল ও পুষ্পসমুদয় ম্লান ও বিশীর্ণ হইয়া যায় তখন উহাদের স্পর্শজ্ঞান বিষয়ে সংশয় কি? যখন বায়ু, অগ্নি ও বজ্রের শব্দে উহাদের ফলপুষ্প বিশীর্ণ হইয়া পড়ে তখন শ্রবণশক্তি, এবং যখন লতাসমূহ বৃক্ষের নিকট আগমন, উহাকে পরিবেষ্টন ও ইতস্তত গমন করে তখন দর্শনশক্তি স্বীকার করিতে হইবে। যখন পবিত্র ও অপবিত্র গন্ধ এবং বিবিধ ধূপ দ্বারা রোগবিহীন হইয়া পুষ্পিত হইতেছে তখন

আঘ্রাণশক্তি এবং মূলদ্বারা সলিলপান রসনেন্দ্রিয়ের অস্তিত্ব প্রমাণ করে, যখন সুখদুঃখসংযুক্ত এবং ছিন্ন হইলে পুনরায় প্ররোহিত হইতে দেখা যায় তখন জীবন স্বীকার করিতেই হইবে।"

ধর্মোত্তর তাঁর ন্যায়বিন্দু টীকায় লিখেছেন—স্বাপঃ রাত্রৌ পত্রসংকোচ, নহি সর্বে বৃক্ষাঃ। পাতা সংকোচ ক'রে রাত্রে নিদ্রা যাওয়া (nyctitropic movement) তাঁরা লক্ষ্য করেছিলেন। উদয়ন কিরণাবলীতে বলেছেন (পৃথিবী নিরূপণম্)— ইত্থং প্রতিনিয়ত ভোক্তধিষ্টিতাঃ জীবনমরণস্বপ্নজাগরণরোগভেষজপ্রয়োগ-সজাতীয়ানুবিদ্ধানুকূলোপমপ্রতিকূলোপগমাদিভ্যঃ। প্রসিদ্ধ শরীরবৎ॥ এখানে গাছের জীবন, মরণ, ঘুম, জাগরণ, অনুকূল জিনিসের দিকে গমন, প্রতিকূলের দিক থেকে চ'লে আসা প্রভৃতি লক্ষণ ব'লে উক্ত হয়েছে।

গুণরত্ন উদ্ভিদের লক্ষণের মধ্যে চলন, নিদ্রা, জাগরণ, প্রসার, স্পর্শ, সংকোচ এবং দুর্বলদেহীর অবলম্বনের দিকে গমন করিবার ক্ষমতার কথা বলেছেন। উদাহরণ দিয়েছেন—লজ্জালুপ্রভৃতীনাং হস্তাদিসংস্পর্শাৎ পত্রসংকোচাদিকা। পদ্মাদীনাং প্রাতর্বিকসনং, ঘোষাত্যকাদিপুষ্পাণাং চ সন্ধ্যায়াং, কুমুদাদীনাং তু চন্দ্রোদয়ে। শঙ্করমিশ্রও একই কথা বলেছেন। গাছের সূর্যমুখী, আদিত্যক্রান্তা, অঞ্জলীকঙ্ক, নমস্কারী নাম তাদের দেহের কিংবা দেহের অংশবিশেষের চলন থেকেই দেওয়া হয়েছে।

চে ত ন—বৈদিক সাহিত্যে উদ্ভিদকে প্রাণবন্ত ধ'রেই সব সময় অভিনন্দন করা হয়েছে। মহাভারতকার শান্তিপর্বে এবং মনু উদ্ভিদের চেতনাশক্তি স্বীকার করেছেন। উদয়ন লিখেছেন—অতিমন্দান্তঃসজ্ঞিতয়া। গুণরত্ন স্পষ্ট ক'রেই বলেছেন—অতঃ পুরুষশরীরতুল্যত্বাৎ সচেতনো বনস্পতিরিতি। চক্রপাণি ভানুমতীতে গাছের সম্বন্ধে লিখেছেন—বৃক্ষাস্তু চেতনাবন্তোঽপি তমসাচ্ছন্নজ্ঞানতয়া শাস্ত্রোপদেশবিষয়া এব। সুতরাং হিন্দু বৈজ্ঞানিক গাছের চৈতন্য থাকা সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ ছিলেন।

গা ছে র লি ঙ্গ ভে দ—১৭শ শতাব্দীর আগে উদ্ভিদের লিঙ্গের অস্তিত্ব সম্বন্ধে কোনো জ্ঞান ছিল না। এই শতাব্দীর শেষ ভাগে ক্যামেরিয়স্

প্রথমে ফুলের সঙ্গে যৌন প্রজননের সম্বন্ধ আবিষ্কার করেন। এ বিষয়ে হিন্দুসাহিত্যে বড় বেশি খবর পাওয়া যায় না। কেবল ফুল থেকে ফল, এবং ফুলকে নারীর রজঃস্রাবের সঙ্গে তুলনা করে স্থমনস্[1] বলা হয়েছে। ধন্বন্তরী নিঘণ্টুতে গাছের জাতি-লিঙ্গের উল্লেখ দেখি, কিন্তু বর্ণনা নেই। এ বিষয়ে একমাত্র আলোচনা পাই হারীতসংহিতায়। বিজ্ঞানসম্মত না হলেও এখানে উদ্ধৃত করা গেল—

হারীত উবাচ—সংযোগেন বিনা প্রাজ্ঞঃ কথং গর্ভো ন জায়তে।
সংযোগেন বিনা পুষ্পং ফলং বা ন কথং ভবেৎ॥
বৃক্ষবন্ন কথং স্ত্রীণাং ফলোৎপত্তি প্রদৃশ্যতে॥

আত্রেয় উবাচ—বিরুদ্ধানাঞ্চ বল্লীনাং স্থাবরাণাঞ্চ পুত্রক।
তত্র ধাতুসমং বীজং সহযোগেন বর্ততে॥
ন ভিন্নদৃষ্টিস্তস্তেব দৃশ্যতে শৃণু পুত্রক।
স্থাবরাণাঞ্চ সর্বেষাং শিবশক্তিময়ং বিদুঃ॥
নিশ্চলোঽপি শিবো জ্ঞেয়া ব্যাপ্তিশক্তি মহামতি।
তত্র স্ত্রীপুরুষগুণা বর্তন্তে সমযোগতঃ॥
আম্রপুষ্পং ফলং তদ্বদ্ বীজং শুক্রময়ং বিদুঃ॥

চরক একস্থানে বলেছেন—বৃহৎফলং শ্বেতপুষ্পৈঃ পুমান্। শামারুণা-পুষ্পী স্ত্রী। অসিত কুটজ। একমাত্র ধন্বন্তরী নিঘণ্টুতে দেখতে পাই—কেতকীদ্বয়ং। স্বর্ণকেতকী স্ত্রী এবং সিতকেতকী পুরুষ। ভাব-প্রকাশে সিতকেতকীকে কেতক বলা হয়েছে—রাজনিঘণ্টুকার লক্ষণ দিয়েছেন—বিফলা ধূলিপুষ্পিকা এবং স্বর্ণকেতকীকে বলা হয়েছে কনকপ্রসবা, সুগন্ধিনী।

বং শ বি স্তা র—উদ্ভিদের বংশবিস্তারের যতপ্রকার উপায় বর্তমানে জানা আছে এবং প্রয়োগ করা হয় তার সবগুলিই প্রাচীন বৈজ্ঞানিকের জানা ছিল। যেমন বীজরুহ, মূলজ, স্কন্ধজ, স্কন্ধে রোপণীয়া, অগ্রবীজ, পর্ণযোনি এবং সৌনরুধজ। অর্থশাস্ত্র, বৃহৎসংহিতা, মনুসংহিতা,

১ স্ত্রীণাং স্থমনসাং পুষ্পং প্রসূনং সমম্।—অমরকোষ, বনৌষধিবর্গ ৫০।

অভিধানচিন্তামণি প্রভৃতি গ্রন্থে এদের প্রত্যেকটির উদাহরণ দেওয়া আছে। যেমন—

কুরণ্টাদ্যা অগ্রবীজাঃ, মূলজাস্তুত্‌পলাদয়ঃ, পর্বযোনয়ঃ ইক্ষ্বাদ্যাঃ স্কন্ধজাঃ শল্লকীমুখাঃ। শাল্যাদয়ো বীজরুহাঃ সংমূর্ছনাস্তৃণাদয়ঃ। স্যুর্বনস্পতিকায়স্য ষড়েতে মূলজাতয়াঃ॥ হেমচন্দ্র।

বৃহৎসংহিতায় গাছের কলম দুই রকম ভাবে করার ব্যবস্থা আছে। একপ্রকার ডাল এবং শিকড়ের সংযোগ, অপরটি ডালের সঙ্গে ডালের সংযোগ। বুদ্ধঘোষ প্রত্যেক প্রকার বংশবিস্তারের আরও বেশি ক'রে উদাহরণ দিয়েছেন (সুমঙ্গলবিলাসিনী দীঘনিকায়ঃ ১।১।১১)।

নানাপ্রকার উপায়ের নাম ক'রেই তাঁরা ক্ষান্ত হন নি। ঋতু হিসাবে কি ভাবে তাদের, বিশেষ করে কাণ্ড বীজ, লাগাতে হবে তার নির্দেশ দিয়েছেন। মাঘফাল্‌গুনে (শিশিরে) অজাতশাখ বৃক্ষের ডাল—অজাত লতাঙ্কুরান্ বৃক্ষান্, হেমন্তে জাতশাখান্, বর্ষাগমে সুস্কন্ধান্—ডাল বিধানত লাগাতে হবে, দূরে দূরে বুনতে হবে; কারণ চারা যদি কাছাকাছি হয় তবে মিশ্রৈমূলৈশ্চ ন ফলং সম্যগ্‌গচ্ছন্তি পীড়িতাঃ। মাটিতে বোনার পর গাছে জল দিতে হবে। যদি কলমের ডাল—কাণ্ডরোপ্যা—দূরে নিতে হয় তবে গোময় দিয়ে প্রলেপ দিতে হবে—আমূলস্কন্দলিপ্তানাং।

ব্যা ধি—গাছের প্রাণীশত্রু ও তাদের প্রতিকারের কথা বৈদিক সাহিত্যেই পাই। কিন্তু ইক্ষু এবং শস্যের ব্যাধির উল্লেখ সর্বপ্রথমে পাই বিনয়পিটকে (চুল্লবগ্‌গ ১০।১।৬)। বৃহৎসংহিতায় গাছের রোগ, তার লক্ষণ ও প্রতিকারের ব্যবস্থা দেওয়া আছে—এতৈশ্চিহ্নৈস্তরুঃ সরোগো জ্ঞেয়ঃ; চিহ্ন (symptoms)-গুলির উল্লেখ আছে। এবং রোগাক্রান্ত অংশ কেটে ফেলবার উপদেশও আছে। ভট্টোৎপল বৃহৎসংহিতার টীকায় কাশ্যপের গ্রন্থে[১] গাছের রোগের নিদান, চিকিৎসা প্রভৃতি উল্লেখ করেছেন।

১ এ গ্রন্থ পাওয়া যায় নি।

৫. বাস্তুসংস্থান—কতকগুলি লক্ষণ হিসাবে দেশ এবং স্থানকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে, যথা—জাঙ্গল, অনূপ এবং সাধারণ। কৌটিল্য অর্থশাস্ত্রে এই সমস্ত দেশে বছরে কতখানি বৃষ্টিপাত হয় তার হিসাব দেওয়া আছে। উল্লেখযোগ্য যে, বৃষ্টি মাপতে যন্ত্র (rain gauge) ব্যবহার করা হ'ত। চরকে (কল্পস্থান ৬।৭।৯) এবং সুশ্রুতে (সূত্রস্থান ৩৫।৩৪-৪২) এই তিন প্রকার জমির আবহাওয়া এবং বিশিষ্ট গাছপালার বিবরণ দেওয়া আছে। তার কিছু এখানে উদ্ধৃত করা গেল।

জা ঙ্গ ল—মরুভূমিসদৃশ দেশ। এদেশে খদির, অসন, অশ্বকর্ণ, সোমবল্ক, বদরী, শমী এবং তৎসদৃশ ব্যতীত অন্য বৃক্ষাদি জন্মে না।

অ নূ প—জলবহুল দেশ, মাটি আর্দ্র কিংবা জলাভূমি। এখানে বঞ্জুল, হিন্তাল প্রভৃতি জন্মে। বৃহৎসংহিতায় এই প্রদেশের গাছপালার দীর্ঘ তালিকা আছে। অমরকোষে (পাতালবর্গ ৫০-৫৬) বহু জলজ উদ্ভিদের নাম আছে, যথা—কহ্লার, সৌগন্ধিক, হল্লক, উৎপল, কুবলয়, ইন্দীবর, কুমুদ, পদ্ম, বারিপর্ণী, মুষাকর্ণী, জলনীলী, শৈবাল, ইত্যাদি।

সা ধা র ণ—এই প্রদেশ জাঙ্গল এবং অনূপ প্রদেশের মধ্যাবস্থা। অত্রস্থ বৃক্ষাদিও সাধারণ, যথা—বনস্পতি, লতা, গুল্ম, মান্দার, পারিজাতক, সন্তান প্রভৃতি।

এ ছাড়া কোথাও কোনো বিশেষ গাছের সংখ্যাধিক্য দেখা গেলে সেই স্থান সেই গাছের নামে নির্দেশিত হ'ত, যথা—কুমুদ্বতী, নড্বল, বেতস্বান্, শাদ্বল, কুশদ্বীপ প্রভৃতি।

৬. শ্রেণীবিভাগ—আমরা পূর্বে দেখেছি, পরিচিত গাছপালার সংখ্যা বেশি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাদের নামকরণ ও শ্রেণীবিভাগের প্রয়োজন হ'ল। সুতরাং শ্রেণীবিভাগের দুটি অংশ—একটি নামকরণ অপরটি শ্রেণীবিভাগ।

নামকরণ—সার উইলিয়ম জোন্‌স্ লিখেছেন—লিনিয়স (যিনি আধুনিক যুগে নামকরণ প্রচলন করেন) যদি এই দেশের ভাষা এবং উদ্ভিদের নামের সঙ্গে পরিচিত হতেন, তা হ'লে এ দেশীয় গাছপালার

দেশীয় নামই গ্রহণ করতেন। হিন্দু বৈজ্ঞানিক প্রত্যেক গাছের নাম দিয়েছিলেন এক-একটি বিশিষ্ট রীতি ধ'রে, যেমন—

(১) কোন বিশিষ্ট ঘটনা বা সংযোগ—বোধিক্রম, অশোক, শিবশেখর, যজ্ঞডুম্বর ইত্যাদি।

(২) বিশিষ্ট গুণ—

ভৈষজ্য	দদ্রুঘ্ন, অর্শোঘ্ন, বাতারি।
সাংসারিক	বাণীর, দণ্ডধাবন, কার্পাস, লেখন।
প্রকৃতি	ফেনিল, বহুপাদ, চর্মিন।
শারীরিক গঠন	দ্বিপত্র, ত্রিপত্র, সপ্তপর্ণ।
পাতার আকৃতি	দীর্ঘপত্রক, কীষপর্ণী, পঞ্চাঙ্গুল।
ফুলের বর্ণ, আকৃতি	হেমপুষ্প, বক্রপুষ্প।
বিশিষ্ট চিহ্ন	শতমূলী, শতপর্বিকা, ত্বকসার।
দেশজ্ঞাপক	সৌবীর, চাম্পেয়, মাগধী।
পরিবেশ	নদীসর্জ, জলজ, বানপ্রস্থ, মরুবক, কুটজ।
বিবিধ	বকুল, শীতভীরু, মাঘ্য, শারদী।

সব চেয়ে আশ্চর্যের বিষয় যে, হিন্দু আচার্যগণ প্রত্যেকটি গাছের দুটি করে নাম দিতেন— একটি পরিচয়জ্ঞাপিকা সংজ্ঞা, অপরটি গুণপ্রকাশিকা সংজ্ঞা। আধুনিক বৈজ্ঞানিক গ্রন্থেও এ-রকম নামকরণের পদ্ধতি দেখতে পাওয়া যায় না।

গাছের নাম	পরিচয়-সংজ্ঞা	গুণ-সংজ্ঞা
বকফুল	বক্রপুষ্প	ব্রণারি
অপামার্গ	ক্ষরমঞ্জরী	কিণিহী
আকন্দ	ক্ষীরকাণ্ডক, তুলাফল	খর্জঘ্ন
ধুতুরা	ঘণ্টাপুষ্প	মহামোহী
নীল	নীলপুষ্পী	রঞ্জনী

শ্রেণীবিভাগ—হিন্দু আচার্যগণ উদ্ভিদকে ভাগ করতেন তিন প্রকার নিয়ম বা প্রণালীতে,—(১) ঔদ্ভিদ (botanical), (২) বিরেচনাদি

(medicinal) এবং (৩) অন্নপানাদি (dietetic)। নামকরণ এবং শ্রেণীবিভাগের পদ্ধতি দেখে অনুমান করা যায় যে, ভারতবর্ষে উদ্ভিদবিজ্ঞান স্বতন্ত্রভাবে গ'ড়ে উঠেছিল। আমরা ঐ তিন প্রকার শ্রেণীবিভাগের পৃথক্ ভাবে পরিচয় দেব।

ঔ দ্ভি দ—চরক এবং সুশ্রুত সমস্ত উদ্ভিদকে ভাগ করেছেন—বনস্পতি, বানস্পত্য, ওষধি, বীরুধ, লতা, (প্রতানিনী, বল্লী), গুল্ম এবং তৃণ (বাঁশগাছ, তৃণধ্বজ), উদ্ভিদ (ছত্রা), শৈবাল, প্লব।[১] গাছের পরিবার হিসাবে কোনো শ্রেণীবিভাগ পাই না। সেটা পাশ্চাত্য দেশেও অত্যন্ত আধুনিক। তবে একই রকম গাছ, ফুলের গন্ধ, বর্ণ প্রভৃতির পার্থক্য হিসাবে পৃথক করা হ'ত। কিন্তু গাছের আধুনিক গণ (genus) এবং প্রজাতির (species) ইঙ্গিত পাই, যথা—

কোবিদার—শ্বেতপুষ্প রক্তপুষ্প পীতপুষ্প। আবার শ্বেতপুষ্প কোবিদারকে গন্ধ হিসাবে ভাগ করা হয়েছে—শ্বেত কোবিদার নির্গন্ধ, শ্বেত কোবিদার সুরভি কুসুম। শেষের দুইটি প্রকার (varieties) এবং প্রথম তিনটি আধুনিক প্রজাতি (species)।

বলাচতুষ্টয়ম্,—বলা, অতিবলা, মহাবলা, নাগবলা।

ঝিণ্টিচতুষ্টয়ম,—শিগ্রু ত্রয়ম্, শ্বেতপীতনীলপুষ্পভেদাৎ ত্রয়ো ভৃঙ্গরাজাঃ সপ্ত। ইত্যাদি।

বি রে চ না দি—চরক প্রথমেই ভাগ করেছেন ভেষজের গুণ ও প্রয়োগ হিসাবে, বিরেচন ও কষায় দুই ভাগে। বিরেচন ৬০০ এবং কষায় ৫০০ গাছ। পাঁচ শত কষায় গাছকে প্রথমে ৫০ এবং পরে ১০টি বর্গে ভাগ করা হয়েছে। ১ম বর্গ—জীবনীয়, বৃংহনীয়, লেখনীয়, ভেদনীয় ইত্যাদি। ২য় বর্গ—বর্ন্য, বল্য, কণ্ঠ্য ইত্যাদি।

১ তে বনস্পতয়ঃ প্রোক্তা বিনা পুষ্পৈর্ফলন্তি যে। ক্রমাশ্চান্তে নিগদিতা পুষ্পৈঃসহ ফলন্তি যে॥ প্রসরতি প্রতানৈর্যাস্তা লতা পরিকীর্তিতাঃ। বহুস্তম্বা বিটপিনো যে তে গুল্মাঃ প্রকীর্তিতাঃ।

স্থাবরাস্তৃনৌষধিবৃক্ষলতাবতানবনস্পতয়ঃ ইতি। প্রশস্তপাদ।

৩য় বর্গ—কফঘ্ন, কুষ্ঠঘ্ন, অর্শঘ্ন ইত্যাদি। ৪র্থ বর্গ—স্তন্যজনন, শুক্রজনন ইত্যাদি। ৫ম বর্গ—স্নেহোপগ, স্বেদোপগ ইত্যাদি। ৬ষ্ঠ বর্গ—ছর্দ্দিনিগ্রহণ, তৃষ্ণানিগ্রহণ ইত্যাদি। ৭ম বর্গ—পুরীষসংগ্রহণীয়, মূত্রসংগ্রহণীয় ইত্যাদি। ৮ম বর্গ—কাশহর, শ্বাসহর ইত্যাদি। ৯ম বর্গ—দাহপ্রশমন। ১০ম বর্গ—শোণিতস্থাপন, বেদনাস্থাপন ইত্যাদি। প্রত্যেকটি বর্গের আবার উপবর্গ আছে, এবং গাছগুলিকে তাদের গুণ হিসাবে প্রত্যেকটি উপবর্গের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

সুশ্রুত সে সময়ে জানা সমস্ত উদ্ভিদকে ৩৭টি গণে ভাগ করেছেন, এবং প্রত্যেকটি গণের নাম করেছেন সেই গণের অন্তর্গত গাছগুলির প্রধান গাছের নামে, যেমন বিদারীগন্ধাদিগণ, আরগ্বধাদিগণ, বরুণাদিগণ, সালসারাদিগণ ইত্যাদি।

অ ন্ন পা না দি—সমস্ত গাছপালাকে মানবের আহার্য হিসাবে চরক ৬টি বর্গে ভাগ করেছেন, যেমন শূকধান্যবর্গ, শমীধান্যবর্গ, শাকবর্গ, ফলবর্গ, হরিতবর্গ, ইক্ষুবর্গ এবং আহারযোগী বর্গ। এখানে প্রত্যেক গাছের খাদ্যোপযোগী অংশ, তাদের গুণাবলী, কোথায় পাওয়া যায়, সব বর্ণিত আছে, কিন্তু এ বিষয়ে সুশ্রুত আরও বেশি খবর দিয়েছেন। তিনি সমস্ত গাছকে ৩৭ ভাগে ভাগ করেছেন, যথা—শালীধান্যবর্গ, ষষ্টিকধান্যবর্গ, ব্রীহিধান্যবর্গ, কুধান্যবর্গ, বৈদলবর্গ, তিলবর্গ, যববর্গ, শিম্বিবর্গ, ফলবর্গ, শাকবর্গ[১], পুষ্পবর্গ, উদ্ভিদবর্গ (mushroom), কন্দবর্গ, তৈলবর্গ, ইক্ষু বর্গ[২] ইত্যাদি।

অমরকোষের বনৌষধিবর্গ এবং বৈশ্যবর্গে আরও বিশদভাবে প্রত্যেক বর্গের উল্লেখ আছে। ভাবপ্রকাশ সুশ্রুতের বর্গের সঙ্গে হরীতক্যাদিবর্গ, কর্পূরাদিবর্গ, গুড়ূচ্যাদিবর্গ, বটাদি এবং আম্রাদিবর্গ যোগ করেছেন।

১ মূলপত্রকরীরাগ্রফলকাণ্ডাদিরূঢ়কম্। ত্বকপুষ্পং কবকশ্চৈব শাকং দশবিধং স্মৃতং।

২ পৌণ্ড্রকী ভীরুকশ্চৈব বংশকঃ শতপোরকঃ। কান্তারস্তাপসেক্ষুশ্চ কাষ্ঠেক্ষুঃ সূচিপত্রকঃ॥ নৈপালী দীর্ঘপত্রশ্চ নীলপোরোঽথ কোশকৃত্। ইত্যেতা জাতয়…॥১৫০॥

৭. **ক্রমবিকাশ**—বৈদিক আর্যগণ সিদ্ধান্ত করেছিলেন যে, পৃথিবীতে মানবের অভ্যুদয়ের আগে উদ্ভিদের আগমন। এবং আমাদের পরবর্তী দর্শন, সাহিত্য প্রভৃতি শাস্ত্রে ক্রমবিকাশবাদ সম্বন্ধে একটা নিশ্চিত ধারণার বহু উল্লেখ আছে।

পৃথিবীর উৎপত্তি এবং তার উপরে প্রাণিগণের উৎপত্তি বিষয়ে ভগবান বুদ্ধ বলছেন, যখন পৃথিবী দ্রব অবস্থা থেকে কঠিন অবস্থায় পরিণত হয়ে প্রাণীর বাসের উপযোগী হ'ল, তখন প্রথমে নিম্নশ্রেণীর গাছপালা এবং ক্রমে উচ্চতর উদ্ভিদের আবির্ভাব হয়েছিল। তারপরে পৃথিবীতে মানবের আবির্ভাব। রামায়ণে (উত্তর কাণ্ড ৭২) এ বিষয়ে আর একটু স্পষ্ট ক'রে বলা হয়েছে। একটি গাছের উপর বাসার স্বত্ব নিয়ে একটি পেঁচা এবং শকুনি শ্রীরামচন্দ্রের নিকট নালিশ করেছিল। কতদিন তারা সেখানে বাস করছে জিজ্ঞাসা করায় শকুনি বলল, যতদিন পৃথিবীতে মানব বাস করছে; আর পেঁচা বললো, যতদিন থেকে পাদপৈরুপশোভিতা। শ্রীরামচন্দ্র পেঁচাকে বাসার দখল দিলেন। বৃহদ্‌বিষ্ণুপুরাণে ক্রমবিকাশের নিম্নলিখিত বিবরণ দেওয়া আছে।

স্থাবরং বিংশতের্লক্ষং জলজং নবলক্ষকং।
কূর্মাশ্চ নবলক্ষঞ্চ দশলক্ষং চ পক্ষিণঃ ॥
ত্রিংশ লক্ষং পশূণাঞ্চ চতুর্লক্ষং চ বানরাঃ।
ততো মনুষ্যতাং প্রাপ্য ততঃকর্মাণি সাধয়েৎ ॥

৮. **বংশানুক্রম**—হিন্দু আচার্যগণ বংশানুক্রম সম্বন্ধে প্রশ্ন তুলে মীমাংসার চেষ্টা করেছিলেন। বৃহদারণ্যকভাষ্যে শঙ্কর এই প্রশ্ন তোলেন—কি প্রকারে বংশের গুণ (specific characters) বংশানুক্রমে পরিচালিত হয় (transmitted)? কোনো জাতির (species) সন্তান পিতামাতার মতো হয় কেন? কিংবা অশ্বত্থগাছের বীজ হতে অশ্বত্থগাছ হয় কেন?

চরক এবং সুশ্রুত এই প্রশ্নের উত্তর দিতে চেষ্টা করেছিলেন। চরক বলেন, মাতৃগর্ভে নিষিক্ত ডিম্বাণুর মধ্যে সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ প্রচ্ছন্নভাবে

থাকে। উদাহরণস্বরূপ বলেছেন, যেমন বাঁশের বীজে কিংবা আমের ফুলের মধ্যে ভবিষ্যৎ বাঁশ কিংবা আম-গাছের সমস্ত অবয়বই অব্যক্ত অবস্থায় থাকে এবং সন্তানে তাদের ক্রমবিকাশ হয়, অথচ প্রথম অবস্থায় তাদের দেখা যায় না। তেমনই নিষিক্ত ডিম্বাণুতে সন্তানের সমস্ত অঙ্গই প্রচ্ছন্নভাবে থাকে।

চরক মনে করেন, শুক্রাণুতে পিতার অবয়বের সমস্ত গুণই অব্যক্ত ভাবে অবস্থিত থাকে। শঙ্করও সেই কথাই বলেন,—যথা শরীরধাত্বাত্মা শুক্রভূতঃ অঙ্গাদঙ্গাৎ সম্ভবতি।

এই যদি হয় তবে পৈতৃক বিকলাঙ্গ কিংবা কোনো ব্যাধি সন্তানে সঞ্চারিত হয় না কেন? এ প্রশ্নের উত্তর দিতে চরক আত্রেয়কে স্মরণ করেছেন। নিষিক্ত ডিম্বাণু সমুদায়াত্মক, সমুদায়প্রভব। যদি জনক-জননীর বীজ দৈবাৎ কিংবা অন্যপ্রকারে উপতপ্ত (affected) হয় তবেই বিকৃতি সম্ভব, নতুবা নয়। আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল ইহাকে আত্রেয়ের জার্ম্‌প্লাজ্‌ম্‌-বাদ বলে অভিহিত করেছেন। ডারুয়িনের gemmules এবং স্পেন্সারের "ids"-বাদের চাইতে আত্রেয়বাদ যে সত্যের দিকে অনেকখানি এগিয়ে ছিল সেটা স্বীকার করতেই হবে। চরক অনিষ্টাহারের ডিম্বাণুর উপর প্রভাব অস্বীকার করেন নি।

৯. **অনৈসর্গিক উদ্ভিদ**—হিন্দুবৈজ্ঞানিক উদ্ভিদবিদ্যা আয়ত্ত ক'রেই ক্ষান্ত হন নি, উদ্ভিদের উন্নতিবিধানেরও যথেষ্ট চেষ্টা করেছিলেন। বৃহৎসংহিতায়, শার্ঙ্গধরপদ্ধতিতে গন্ধহীন পুষ্পকে গন্ধযুক্ত করার, কার্পাসের সাদা তুলাকে গাছের ফলের মধ্যেই লাল হলুদ এবং আকাশের মত নীল তুলায় পরিণত করার উপায়ের উল্লেখ আছে। এইভাবে ফুলফলের উন্নতি করার কথা বলা হয়েছে।

১০. **বিবিধ প্রয়োগ**—বৃহৎসংহিতায় উদ্ভিদবিদ্যার প্রয়োগ সম্বন্ধে দুইটি অধ্যায় আছে। একটি অধ্যায়ে ফল এবং ফুলের প্রাচুর্য প্রভৃতি দেখে জিনিসপত্রের স্থুলভত্ব নির্ণয় করার কথা বলা আছে—

ফলকুসুমসম্প্রবৃদ্ধিং বনস্পতীনাং বিলোক্য বিজ্ঞেয়ম্।
সুলভতাং দ্রব্যাণাং নিষ্পত্তিশ্চাপি শস্যানাম্॥

আমাদের বাংলা দেশেও বলে, আমে ধান তেঁতুলে বান।

দ্বিতীয় অধ্যায়টিতে গাছের উপস্থিতি দেখে জলহীন প্রদেশে জলের অস্তিত্ব অনুমান করা এবং গাছের অবস্থা দেখে আসন্ন বৃষ্টির কথা বলা হয়েছে—বৃষ্টিলক্ষণম্।

এই অধ্যায়ে ১১৫টি শ্লোকে মাটির নীচে গাছকে অবলম্বন করে জলের শিরার সন্ধান দেওয়া আছে। উদাহরণ হিসাবে জাতকের একটি গল্প এখানে উদ্ধৃত করা গেল। একদা বোধিসত্ত্ব অনেক জিনিসপত্র লোকজন প্রভৃতি সঙ্গে নিয়ে বাণিজ্যে বেরিয়েছেন। পথ ভুলে তিনি এক বিশাল শুষ্ক প্রান্তরে এসে উপস্থিত হলেন। জলাভাবে ভীষণ কষ্ট দেখা দিল, তিনি এতগুলি জীবের প্রাণ বাঁচাতে চিন্তিত হয়ে পড়লেন। ভোরবেলা তিনি অশান্ত মনে পায়চারি করতে করতে দেখতে পেলেন, একস্থানে একটি কুশের ঝোপ। তাঁর মনে হ'ল, জল বিনা এ কুশ বাঁচতে পারে না, সুতরাং এর নীচে নিশ্চয় জল আছে। খুঁড়তে গিয়ে দেখা গেল, সত্যই সেখানে মাটির নীচে জলের শিরা ছিল।

উপসংহার

ভারতে উদ্ভিদবিদ্যার আরম্ভ, প্রসার ও বাস্তব জীবনে তার প্রয়োগের যে ইতিহাস, পৃথিবীর যে-কোনো দেশের জাতীয় জীবনে সেটা গৌরবের বিষয় ব'লে গণ্য করা যায়। সমসাময়িক কোনো জাতির মধ্যে উদ্ভিদবিদ্যার এমন সর্বতোমুখী প্রসার দেখা যায় না। হিন্দুর জাতীয় জীবনে পরে যে দুর্ভাগ্য এসেছিল তা থেকে তার সমাজ, সাহিত্য, শাস্ত্র, দর্শন, বিজ্ঞান কিছুই রেহাই পায় নি। অবশ্য, মানুষের জীবনে যেমন উত্থান-পতন আসে, জাতির জীবনেও সেটা আসতে পারে। কিন্তু যে জাতির অতীত এত গৌরবময়, তার ভবিষ্যৎও বেশি দিন অন্ধকারে থাকতে পারে না।

জাতির অতীত গৌরবের ইতিহাস যাঁরা লেখেন, তাঁদের প্রধান উদ্দেশ্য দুটি—প্রথম, নিজেদের অতীত খুলে ধ'রে বংশধরদের সেই অতীত গৌরব ফিরিয়ে আনতে উৎসাহিত করা ; দ্বিতীয়, পৃথিবীর জ্ঞানবিজ্ঞানের ইতিহাস-লেখকদের জানানো এই ইতিহাস রচনায় আমার দেশের দান কতখানি।

এ ছাড়া আপন পূর্বপুরুষের গৌরবময় অতীতের কথা আলোচনায় আত্মপ্রসাদ এবং আত্মবিশ্বাস লাভ হয় তাতে সন্দেহ নেই।

॥ ১৩৫০ ॥

১. সাহিত্যের স্বরূপ : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
২. কুটিরশিল্প : শ্রীরাজশেখর বসু
৩. ভারতের সংস্কৃতি : শ্রীক্ষিতিমোহন সেন শাস্ত্রী
৪. বাংলার ব্রত : শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর
৫. জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কার : শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য
৬. মায়াবাদ : মহামহোপাধ্যায় প্রমথনাথ তর্কভূষণ
৭. ভারতের খনিজ : শ্রীরাজশেখর বসু
৮. বিশ্বের উপাদান : শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য
৯. হিন্দু রসায়নী বিদ্যা : আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়
১০. নক্ষত্র-পরিচয় : অধ্যাপক শ্রীপ্রমথনাথ সেনগুপ্ত
১১. শারীরবৃত্ত : ডক্টর রুদ্রেন্দ্রকুমার পাল
১২. প্রাচীন বাংলা ও বাঙালী : ডক্টর সুকুমার সেন
১৩. বিজ্ঞান ও বিশ্বজগৎ : অধ্যাপক শ্রীপ্রিয়দারঞ্জন রায়
১৪. আয়ুর্বেদ-পরিচয় : মহামহোপাধ্যায় গণনাথ সেন
১৫. বঙ্গীয় নাট্যশালা : শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
১৬. রঞ্জন-দ্রব্য : ডক্টর দুঃখহরণ চক্রবর্তী
১৭. জমি ও চাষ : ডক্টর সত্যপ্রসাদ রায় চৌধুরী
১৮. যুদ্ধোত্তর বাংলার কৃষি-শিল্প : ডক্টর মুহম্মদ কুদরত-এ-খুদা

॥ ১৩৫১ ॥

১৯. রায়তের কথা শ্রীপ্রমথ চৌধুরী
২০. জমির মালিক শ্রীঅতুলচন্দ্র গুপ্ত
২১. বাংলার চাষী : শ্রীশান্তিপ্রিয় বসু
২২. বাংলার রায়ত ও জমিদার : ডক্টর শচীন সেন
২৩. আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা : অধ্যাপক শ্রীঅনাথনাথ বসু
২৪. দর্শনের রূপ ও অভিব্যক্তি : শ্রীউমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য
২৫. বেদান্ত দর্শন ডক্টর রমা চৌধুরী
২৬. যোগ পরিচয় : ডক্টর মহেন্দ্রনাথ সরকার
২৭. রসায়নের ব্যবহার : ডক্টর সর্বাণীসহায় গুহ সরকার
২৮. রমনের আবিষ্কার : ডক্টর জগন্নাথ গুপ্ত
২৯. ভারতের বনজ : শ্রীসত্যেন্দ্রকুমার বসু
৩০. ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক ইতিহাস : রমেশচন্দ্র দত্ত
৩১. ধনবিজ্ঞান : অধ্যাপক শ্রীভবতোষ দত্ত
৩২. শিল্পকথা : শ্রীনন্দলাল বসু
৩৩. বাংলা সাময়িক সাহিত্য : শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
৩৪. মেগাস্থেনীসের ভারত-বিবরণ : রজনীকান্ত গুহ
৩৫. বেতার : ডক্টর সতীশরঞ্জন খাস্তগীর
৩৬. আন্তর্জাতিক বাণিজ্য : শ্রীবিমলচন্দ্র সিংহ